শিক্ষা ও দীক্ষা

শিক্ষা ও দীক্ষা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিশার্স্‌
কলেজ ষ্ট্রীট্‌ মার্কেট
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীবারিদকান্তি বসু
শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ, বি-এ

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৩৩

দাম দেড় টাকা

কলিকাতা ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার
আর্ট প্রেসে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, বি-এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের "শিক্ষা ও দীক্ষা" বাহির হইল। দেশে বর্ত্তমানে যে সকল গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে শিক্ষা-সমস্যা তাহার মধ্যে অন্যতম, শুধু তাহাই নহে এই শিক্ষা-সমস্যাই বর্ত্তমানের অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক সমস্যাকে বাড়াইয়া তুলিতেছে। অথচ এই শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে আমাদের চেতনা কতই কম! জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যাহার উপরে নির্ভর করিয়া আছে সেই শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে জাতিকে সচেতন করিবার উদ্দেশ্যেই এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।

"শিক্ষা ও দীক্ষায়" কোনও রাজনৈতিক সমস্যার অবতারণা করা হয় নাই,—ইহা নিছক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রবন্ধসমষ্টি। শিক্ষা কি, শিক্ষা কি ভাবে চলিতেছে, কি ভাবে চলা কর্ত্তব্য ইহাই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। শিক্ষা সম্পকিত ব্যক্তি ও শিক্ষা-সমস্যা লইয়া যাঁহারা ভাবেন এবং যাহাদিগকে ভাবিতে হয় তাঁহাদের এই ধরণের একখানি গ্রন্থ অপরিহার্য্য মনে করিয়াই এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। ইতি—

বিনীত

প্রকাশক।

শিক্ষা ও দীক্ষা

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে—আমাদের দেশে কেন, চীনে, মিশরে, গ্রীসে সকল পুরাতন জাতির মধ্যেই—একটি মহন্মন্ত প্রথা প্রচলিত ছিল যে, শিক্ষালাভ করিতে হইলে যাইতে হইবে কোন বিশেষ গুরুর আশ্রয়ে। সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে, তারপর শিক্ষা। দীক্ষা ব্যতিরেকে কোন শিক্ষা নাই। আজকাল আমাদের চতুর্দ্দিকে শিক্ষা সম্বন্ধে যে বিরাট্ আন্দোলন চলিয়াছে, আমরা যে বলিতেছি সার্ব্বজনীন শিক্ষা 'বাধ্যতামূলক' শিক্ষা ভিন্ন দেশের উন্নতি একেবারে অসম্ভব, সে সকল কলহ কোলাহলের মধ্যে প্রাচীন জগতের এই কথাটি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি অথবা ভুলিয়া না গেলেও, ইহার উপর তেমন মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি না।

শিক্ষা ও দীক্ষা

শিক্ষা জিনিষটী কি? শিক্ষা অর্থে আমরা বুঝি বিদ্যা-অর্জ্জন, বস্তু-পরিচয়, কতকগুলি বিষয়ে বা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ। অথবা শুধু যদি জ্ঞানের দিক না দেখিয়া মানুষের অন্যান্য অংশও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাই, তবে সাধারণভাবে বলিতে পারি, শিক্ষা হইতেছে বৃত্তির চর্চ্চা, অঙ্গের উৎকর্ষসাধন—তাহা বুদ্ধিগত হউক, হৃদয়গত হউক কিংবা শরীরগত হউক। শিক্ষার এই আদর্শ সম্বন্ধে কোথাও যে মতদ্বৈধ হইবে এমন আশঙ্কা কেহ করিবেন না। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, এই শিক্ষাই কি সব? অথবা এই শিক্ষাকে পূর্ণতম করিয়া তুলিতে হইলে কেবল শুধু শিক্ষা, শাস্ত্রজ্ঞান বা বৃত্তির চর্চ্চাই কি উহার আদি মধ্য ও শেষ কথা?

শিক্ষায় চাই বৃত্তির উন্মেষ। ভাল কথা। কিন্তু সমস্যা, কিরূপে? কোথা হইতে আরম্ভ করিয়াছি, কোন্ প্রণালীতে চলিয়াছি? প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি আরম্ভ করিয়াছে বিষয় হইতে। বিষয়কে প্রাধান্য দিয়া বিষয় অনুসারে মানুষকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে, বিষয়ের অনুগত করিয়া, তাহারই ছাঁচে মানুষকে ঢালিতে চেষ্টা করিয়াছে। কেন? কারণ আমাদের কেমন ধারণা আছে যে শিখিবার বস্তু মানুষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, বাহিরের জিনিষ। শিক্ষণীয় যাহা তাহা স্বয়ংসিদ্ধ, নিজের পূর্ণতায় নিজে প্রতিষ্ঠিত, নিজের প্রয়োজনীয়তায় মহনীয়, তাহা অব্যর্থ, অকাট্য। মানুষের কাজ, অর্থ উপার্জ্জনের ন্যায়, তাহা উপার্জ্জন করা, আহরণ করা, নিজের ভাণ্ডারে স্তূপীকৃত করা। ভাণ্ডারীর মর্য্যাদা তাহার ভাণ্ডারের পরিমাণ দেখিয়া। দর্শন বা বিজ্ঞান,

লিখন বা কথন, রাজ্যশাসন অথবা যুদ্ধ এইরূপ এক একটী বিষয়, বিদ্যা, শাস্ত্র—মানুষকে এই সকল জানিতে হইবে, জয় করিতে হইবে, অধিকার করিতে হইবে।

মানুষের সম্মুখে শাস্ত্রমালা যে এই রকমে সাজাইয়া ধরিয়াছি, আধুনিকের মনে তাহার প্ররোচক হইতেছে এই চিন্তা—মানুষকে কোন্ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতে হইবে? জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, জগতে বাঁচিয়া টিকিয়া থাকিতে হইবে—তজ্জন্য কোন্ ঐশ্বর্য্য চাই? কোন্ শাস্ত্রে পারদর্শিতা চাই, কোন্ অঙ্গের, কোন্ বৃত্তির উৎকর্ষ চাই, কতখানি চাই তাহা নিরূপণ করিতে হইবে, তাহা হইতে কি লাভ, কি উপকার তাহা দেখিয়া, জাগতিক অবস্থানে তাহার প্রয়োজন অনুসারে। এ প্রয়োজন অবশ্য নির্ভর করে আমাদের বাহ্য অভিজ্ঞতার উপর, প্রকৃতির তাড়নার উপর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকজন ইংরাজি-জানা কেরাণীর আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা হইতেই ভারতের আধুনিক ইউনিভার্সিটির উদ্ভব। জর্ম্মণীর সাম্রাজ্য রক্ষা বা অতিবৃদ্ধির জন্য সৈন্যের প্রয়োজন, তাই জর্ম্মণীর রাষ্ট্রীয়তাড়নাপিষ্ট শিক্ষা। ইংলণ্ডে যে আজকাল শিক্ষাসংস্কারের কথা হইতেছে, বলা হইতেছে কাব্য বা প্রাচীন সাহিত্যাদির তেমন প্রয়োজন নাই, সর্ব্বাগ্রে চাই পদার্থবিজ্ঞান, তাহার অন্তরে রহিয়াছে এই ভাব—জীবন-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া দিতেছে আমাদের আরও চাই কামান বন্দুক গুলিগোলা। আর আমাদের দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি, তাহারও

পশ্চাতে রহিয়াছে কেমন একটা আতঙ্ক, আমাদের বুঝি যথাযথ অস্ত্রশস্ত্র নাই, পাশ্চাত্যের সহিত যুদ্ধে বুঝি টিকিয়া থাকিতে পারিব না।

কিন্তু এ সকল কথার এই সামান্য ভুলটুকু ধরিতে পারিতেছি না যে, জীবন-সংগ্রামে অস্ত্রশস্ত্রের যতই প্রয়োজনীয়তা থাকুক না কেন, তাহাই প্রধান কথা নয়। আগে চাই মানুষ, এমন মানুষ অন্তরে যে জীবনের স্পন্দন, বীর্য্যের সন্ধান পাইয়াছে। তাহার পক্ষে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হওয়া কঠিন ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ এইরূপ যাহা শুধু শিক্ষা, যাহা শুধু বিষয়পারদর্শিতা, তাহার কুফল অতি সহজেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ এইরূপ শিক্ষা শিক্ষার্থীকে দেখে না, তাহার সহিত কোন সহজ নৈসর্গিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা পায় না, তাহার অন্তরের জীবন-স্পন্দনকে গভীরভাবে দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিতে দেয় না। কতকগুলি বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বলা হইতেছে এই এই বিদ্যায় অভিজ্ঞতা সভ্যতার পরিচয় অথবা জীবনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহাতে শিক্ষার্থীর কি মতামত তাহা জানিবার চেষ্টা হয় নাই, তাহার নিজের অন্তরাত্মার যে কিছু বলিবার আছে তাহা প্রকাশের কোন অবসর দেওয়া হয় নাই। এ সকলে বোধ হয় তাহার সম্মতি থাকিত, সহজেই সে এই শাস্ত্রবিন্যাসের ধারা অনুসরণ করিত, কিন্তু সে সহজ সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ সে পায় নাই। প্রথম হইতেই শাস্ত্রভার তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, জোর করিয়া বলা

হইতেছে এই সকল তোমাকে শিখিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ফলস্বরূপ মানুষের ব্যক্তিত্ব বিশিষ্টতা বলিয়া কোন জিনিষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে না। আপামর সকলকে একই পন্থায় চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, একই ছাঁচে সব মানুষকে পিটিয়া গড়িয়া তোলা হইতেছে। ব্যক্তি ডুবিয়া গিয়াছে সঙ্ঘে। দেশের জাতির সমষ্টিগত উন্নতি প্রয়োজন, চাই তাই দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবিৎ, যোদ্ধা। দেশ তাই এই সকল বিদ্যার জন্য বিদ্যালয় অথবা যন্ত্র স্থাপনা করিয়াছে এবং যন্ত্রে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যবৎ শিক্ষিতেরা সকলে দেশের বাজারে ছড়াইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু এইরূপে মানুষ তাহার স্বাতন্ত্র্য, তাহার বহুভঙ্গিম উদার প্রসারিত স্ফূর্ত্তিটি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

এই বিষয়-অনুগত শিক্ষা যে মানুষের প্রাণের জীবন্ত জিনিষটি নহে, তাহার প্রমাণ, আমরা কোন দিনই স্থির করিতে পারিলাম না, বিষয়-বিন্যাস ঠিক কিরূপে হইবে। সর্ব্বদাই আমরা ইহাকে পরিবর্ত্তন করিতেছি, আবার নূতন করিয়া সাজাইতেছি, আবার ভাঙ্গিতেছি, আবার গড়িতেছি। কিন্তু কিছুতেই ঠিক জিনিষটি ধরিতে পারিতেছি না। কখন বলিতেছি ধর্ম্মশাস্ত্রই শিক্ষার প্রধান বিষয়, কখন বলিতেছি লৌকিক শাস্ত্র,—কখন সাহিত্য, কখন বিজ্ঞান; কখন ইহাদের নানারূপ সংমিশ্রণ করিতেছি; কখন বলিতেছি একটি শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়াই ভাল, আবার বলিতেছি সব বিষয়ই, অন্ততঃ পক্ষে বহু বিষয় জানা প্রয়োজন।

শিক্ষা ও দীক্ষা

এই সম্বন্ধে বাঙ্গলার জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের ইতিহাস অতি সুন্দর উদাহরণ। ইংরাজী ইউনিভার্সিটি প্রকৃত শিক্ষার অনুপযোগী বলিয়া বাঙ্গলায় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ স্থাপিত হয়। অনেকে অনেক আশা করিয়াছিলেন, অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের অবস্থা আজ শোচনীয়, সকলেই দুঃখ করিতেছেন। কিন্তু এই পরিণামের কারণ যে কেহ যথাযথভাবে তলাইয়া দেখিয়াছেন এমন বোধ হয় না। কারণ হইতেছে এই যে, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ ইংরাজী ইউনিভার্সিটিরই অনুকরণে গঠিত, উভয়ের একই প্রণালী একই পন্থা। উভয়েই শিক্ষা দিতে চাহেন বিষয়-নির্ব্বাচনের কৌশলের মধ্য দিয়া। কিন্তু curriculum পরিবর্ত্তন করিলেই শিক্ষার পরিবর্ত্তন হইল না। ইংরাজী বিত্তালয়ে ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী ইতিহাসের উপর জোর দেয়, তুমি না হয় তাহার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত, ভারতীয় সাহিত্য স্থাপন করিলে কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, মূল যে একই রহিয়াছে? জাতীয় বিত্তালয়ের ছাত্র দেশের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বেশী জানিল ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র বিদেশ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বেশী জানিল কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে এমন স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ কি?

দেশে সংস্কৃতের চর্চ্চা হউক, দেশীয় ভাষায় সকলে ব্যুৎপন্ন হউক, দেশের ইতিহাস সকলে জানুক, বিদেশ হইতে সকল জ্ঞানসম্ভার আনিয়া জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি করিব, এ সকলই প্রয়োজন। কিন্তু যদি বলি ইহাই সব বা প্রধান কথা, ইহারই

উপরে শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তবে ভুল বুঝিয়াছি। আগে দেখিতে হইবে দেশের মানুষ। মানুষ অপেক্ষা মানুষের সম্পদ্ মহত্তর জিনিষ নয়। বস্তুপরিচয় বা শাস্ত্রপারদর্শিতা দিয়া মানুষ গড়িয়া তোলা যায় না। মানুষকে বিদ্যায় শাস্ত্রে ভরপুর করিয়া তুলিতে পার কিন্তু তবুও—ঠিক সেই হেতু—শাস্ত্রের মতনই সে হইয়া পড়িতে পারে প্রাণহীন পদার্থ।

মূল কথা এই শিক্ষার আরম্ভ বিষয় দিয়া নহে, শিক্ষার আরম্ভ শিক্ষার্থীকে দিয়া। শিক্ষার্থীর ভিতর হইতে অন্তর হইতে শিক্ষাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে হইবে—সেখানেই সব আছে, বাহিরের যে উপকরণাদি প্রয়োজন তাহা ক্রমে ক্রমে সহায়রূপে ইঙ্গিতরূপে যোগ করিতে হইবে। এইজন্য সকল শিক্ষার্থীর সাধারণ প্রকৃতি, শিশুর সাধারণ মনস্তত্ত্ব জানিলেই হইল না—এ কথাটি আজকাল কেহ কেহ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বুঝিতে হইবে পৃথক্ভাবে। দেখিতে হইবে সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, যে শিক্ষা করিতে আসিয়াছে সে কেমন জীব, তাহার মধ্যে কি শক্তি, কি প্রেরণা, কি আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত রহিয়াছে—কোন্ বিশেষ গুণের আধার হইয়া সে জগতে আসিয়াছে। তাহার আপনার এই আত্মার সহিত তাহাকে পরিচিত করাইয়া দিতে হইবে—আর ইহারই নাম দীক্ষা। দীক্ষা যে পাইয়াছে, নিজের শক্তি, নিজের স্বাতন্ত্র্য, নিজের মধ্যে যে ভাগবত জীব তাহার সন্ধান পাইয়াছে তাহার আপন বিদ্যাসম্ভার সে সহজেই খুঁজিয়া লইবে।

শিক্ষা ও দীক্ষা

আমাদের জাতীয়-শিক্ষা এ কথাটি ধরিতে পারে নাই, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিই ধরিতে পারে নাই। উহারা স্কুলকেই জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে অবশ্যপ্রয়োজনীয় ও একমাত্র সঙ্গী-রূপে। স্কুলে সকলকেই একভাবে এক পদ্ধতি অনুসারে চলিতে হয়—নিজের 'ক্লাসের' সাথে গড্ডলিকা-প্রবাহের মত আপনাকে টানিয়া ঠেলিয়া লইতে হয়। পরিশেষে যখন বিশেষ বিষয়নির্ব্বাচনের সময় উপস্থিত হয় তখন যেমন সুবিধা অথবা যাহার ভাগ্যে যেমন পড়ে সে তেমনি একাধিক অথবা একটিমাত্র বিষয়ে আবদ্ধ থাকে, তাহাতেই তাহার মস্তিষ্ক পরিচালনা করে; যে অভ্যাস বা সংস্কারের বলে সে অসহায়ে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতেই অন্ধ অবোধ যন্ত্রের ন্যায় চলে; সে স্বয়ং, তাহার আত্মা, তাহার বিশিষ্টতা যাহা, কোথায় কবে তাহা নিষ্পিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই আমাদের দেশে শিক্ষিত যুবকগণের মুখে প্রায়শঃ শুনিতে পাই, এত পড়িয়া এত জানিয়া লাভ হইল কি? বৃত্তির চর্চ্চা সে করিয়াছে, কিন্তু আত্মার পরিতুষ্টি দেখে নাই, বৃত্তিকে আত্মার মধ্যে সংযুক্ত করিয়া ধরিতে জানে নাই। তাহার বিদ্যা আরোপ মাত্র, আত্মার মুখে হিরণ্ময় আবরণ মাত্র, তাহা আত্মার স্বতঃস্ফূরিত ঐশ্বর্য্য বিকীরণ নহে।

বিষয়ব্যুৎপত্তি, বৃত্তির চর্চ্চা যে শিক্ষার মূল কথা নহে তাহার কারণ এই মাত্র যে মানুষ শুধু বৃত্তির সমষ্টি নহে। বৃত্তির খেলা মানুষের বহিরঙ্গ, বৃত্তি-বিন্যাসের নিম্নে আর একটি গভীরতর

পদার্থ আছে, যেখান হইতে উহাদের উৎপত্তি, যাহার মধ্যে উহাদের ব্যাখ্যা। তাহা হইতেছে মানুষ স্বয়ং, তাহার নিজস্ব, তাহার আত্মা, তাহার ভাগবত সত্তা। বৃত্তির চর্চ্চা শিক্ষার ফল, অন্যূন পক্ষে গৌণ উপায় বা সহায় মাত্র। সর্ব্বাগ্রে মূলটি, বীজটি ধরিতে হইবে, শিক্ষার্থীর অন্তরাত্মাটিকে সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্বোধন বিষয়ের সাহায্যে হয় না। বিষয় জড় পদার্থ। তাহার সংস্পর্শে চেতন-সত্ত্ব প্রবুদ্ধ হইবে কিরূপে? তাই শিক্ষার আরম্ভ মানুষে মানুষে সহজ আত্মার সংস্পর্শে,—শিক্ষক-ছাত্রে, গুরু-শিষ্যের আত্মা-বিনিময়ে, অর্থাৎ আমরা যেমন বলিয়াছি—দীক্ষায়।

'আত্মা-বিনিময়' কথাটি আমরা নিরর্থক ব্যবহার করি নাই। গুরু শিষ্যকে, শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পৃথকভাবে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং তাহার স্বভাবজ নৈসর্গিক প্রেরণার পন্থায় সে যাহাতে চলিতে পারে তাহা দেখিবেন। কিন্তু কখনই তাহা যন্ত্রের হিসাবে দেখিবেন না, মনে করিবেন না তাহার ভিতরের কলকব্জা জানিলেই তিনি তাহাকে রীতিমত চালাইতে পারিবেন। শিষ্য ছাত্র নিজের জোরে, নিজের প্রকৃতির অব্যর্থ সম্প্রসারণেই অগ্রসর হইবে। শিষ্যের প্রকৃত গুরু তাহার অন্তর্য্যামী পুরুষ। বাহ্য গুরু এই অন্তরের গুরুরই প্রতিকৃতিমাত্র হইতে চেষ্টা করিবেন। শিষ্যের সত্তার মধ্যে অনুস্যূত হইয়া সেই ভাগবত গুরুর সহিত মিশ্রিত হইবেন এবং শিষ্যকে সেই গুরুর প্রেরণাতেই পরিচালিত হইতে দিবেন। দীক্ষার ইহাই মূলতত্ত্ব।

এই দীক্ষা যে পাইয়াছে, নিজের আত্মাকে সে চিনিয়াছে, স্বধর্মে সে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দাকিনী-ধারা উৎস তাহার মধ্যে খুলিয়া গিয়াছে, এ ধারা তখন বহিবে অব্যাহতভাবে ক্রম-প্রসারিত প্রণালীর মধ্য দিয়া। শাস্ত্র বস্তু-পরিচয় বিষয়-ব্যুৎপত্তি সবই যাহাকে শিক্ষা বলিয়া থাকে তাহা এই দীক্ষার প্রয়োগ, উদারণ, প্রকাশমাত্র। স্কুল অথবা পুস্তক প্রভৃতি জ্ঞানের উপকরণ, সমাচার যোগাইবার জন্য। একবার জ্ঞান-পদার্থটি যাহার মধ্যে উদ্ভিন্ন হইয়াছে, এক নৈসর্গিক অনুসন্ধিৎসাও তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন আমরা দেখিব অন্তরের রসলিপ্সাকে অনুসরণ করিয়া সে যে-বিদ্যা ধরিতেছে সরল অভিনিবেশ বলে তাহাতেই ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতেই তাহার এক সহজ প্রতিভা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। শুধু জ্ঞান নয়, সকল বৃত্তিই কেমন অব্যর্থভাবে পরিস্ফুরিত হইতেছে, তাহার সত্তার সকল শক্তিই পূর্ণতার মধ্যে বিধৃত। জাগতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য যেমন প্রয়োজন, সকল ঐশ্বর্য্য সকল বিভূতিই তাহার অঙ্গীভূত হইয়াছে।

ফাল্গুন, ১৩২৩

আমাদের শিক্ষা

আজকাল আমাদের দেশে যে-রকম শিক্ষা প্রচলিত তাহার বিরুদ্ধে খুব একটা আন্দোলন দেখা দিয়াছে। এ দেশের শিক্ষা শিক্ষা-নামের উপযুক্ত নয়। শিক্ষা হইতেছে তাহা যাহা বৃত্তিসকলকে জীবনসামর্থ্যকে মনুষ্যত্বকে শাণিত করিয়া তোলে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা হইতেছে কতকগুলি অবোধ্য মন্ত্র কতকগুলি অর্থশূন্য বুলি কণ্ঠস্থ করা, আর কিছুদিন পরে তাহাও ভুলিয়া যাওয়া; শিক্ষা মানে 'একজামিন্ পাস্', এক-একটা পাশ মানে এক এক তোড়া বেশী টাকা উপার্জ্জনের কলকাঠি। এ ব্যবস্থা ততদিন বেশ চলিয়াছিল যতদিন ইহার ভিতরের মস্ত বড় ফাঁকাটি কাহারও চক্ষে পড়ে নাই বা পড়িবার প্রয়োজনও হয় নাই। আজ কিন্তু আমরা সভয়ে বিস্ময়ে চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছি 'পাস্' মানেই যে টাকা তাহা নয়। তাই সন্দেহ উঠিয়াছে শিক্ষার অর্থ 'পাস্' না হইতেও বা পারে।

সে যাহা হউক, আমাদের দেশের শিক্ষার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাহা এক কথায় এই যে, সে মস্ত একটা কৃত্রিম —unreal জিনিষ। শিক্ষায় এই unreality বা মিথ্যা জিনিষটা যে কি ধরণের, তাহা শুধু যে হাস্যোদ্দীপক এমন নয়, সে যে

কি রকম ভয়াবহ তাহা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একটি সত্য দৃষ্টান্ত দিয়া যেমন বুঝাইয়াছেন তেমন চোখে আঙুল দিয়া আর কিছুতে বুঝান যায় না। একজন আইন (B. L.) পরীক্ষার্থী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি Immovable ও Movable Propertyর ব্যাখ্যা দিতেছেন Immovable property is that which does not move, e. g., a hill, স্থাবর সম্পত্তি তাহা যাহা নড়ে না, যেমন—পাহাড়; আর Movable property is that which moves, e.g., a river, অস্থাবর সম্পত্তি তাহা যাহা নড়ে, যেমন—নদী !! ডবল বিস্ময়সূচক চিহ্ন দিয়াও এ-রকম জ্ঞানের সম্যক্ তারিফ্ আমরা করিতে পারিতেছি না।

শিক্ষায় জ্ঞান হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান যেটুকু আছে সেটুকুও লোপ পাইতে পারে, এমনও সম্ভব হয় দেখিতেছি। অবশ্য এই উদাহরণটি একটা extreme case বা ব্যতিক্রম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যে শিক্ষা-পদ্ধতিতে এমন জিনিষের আদৌ উদ্ভব হইতে পারে তাহার ভিতরে তাহার মূলেই যে কিছু গলদ আছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। আমরা পড়ি শুধু পড়িবার জন্য, সে পড়ার সাথে সত্যের বাস্তবের জগতের জীবনের যে কি সম্বন্ধ—একটা সম্বন্ধ থাকা যে দরকারই, এ কথা ভুলক্রমেও আমাদের মনে হয় না। গোড়ায় এই কথাটি স্রেফ আমরা বাদ দিয়া বসিয়াছি যে জ্ঞানের পরিস্ফূর্তি কাণ্ডজ্ঞানের ভিতর দিয়া,

কাণ্ডজ্ঞানে আসিয়া মিলিতে পারিলেই জ্ঞানের সার্থকতা। কাণ্ডজ্ঞান হইতে বিযুক্ত যে জ্ঞানের রাজ্য সে-টা হইতেছে—fool's paradise—গণ্ডমূর্খের স্বর্গ!

কিন্তু কেন এমন হইল? আমাদের দেশের শিক্ষায় এই যে unreality—এই যে কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, ইহা আসিল কোথা হইতে? চারিদিক হইতে আমরা শুনিতেছি বলা হইতেছে, ইহার জন্য দায়ী বিদেশী ভাষা আর বিদেশী ভাষার দেওয়া বিদেশী ভাব। বস্তুজগতের সাথে, জিনিষের সাথে আমাদের যে পরিচয় হইয়া উঠে না তাহার কারণ জিনিষের ও মনের মাঝে আমাদের দাঁড়াইয়াছে একটা প্রাচীর একটা যবনিকা—এই বিদেশী ভাব, এই বিদেশী ভাষা। যে নামে বস্তুর সহজ পরিচয় হয়, যাহা শুনিবামাত্র বস্তুটিই চোখের সম্মুখে মূর্ত্তি ধরিয়া উঠে, সে নামের পরিবর্ত্তে আমরা দেখিতেছি শুনিতেছি আর-এক দেশ হইতে আম্‌দানী-করা নাম। বস্তুর যে-রূপের সাথে আমাদের নিত্যপরিচিত ঘনিষ্ঠতা তাহাকে ফেলিয়া অপরে বস্তুজগতের কি রূপ দেখিয়াছে ভাবিয়াছে তাহাতেই আমরা গোড়া হইতে অভ্যস্ত হইতে চাই। যে শিক্ষা শিশুকে বাপের পরিচয় দেয় 'ফাদার' নাম দিয়া, আর বকুল শেফালি ছাড়িয়া পাগল হয় ডেজী ও সেলাণ্ডাইনের জন্য, সে শিক্ষা যে বিরাট্ মিথ্যাচার, তাহার ফল যে প্রকাণ্ড অশ্ব-ডিম্বই হইবে ইহা আশ্চর্য্যের কিছু নয়। সুতরাং আমাদের দেশে শিক্ষার সংস্কার করিতে হইলে, ইহাকে real বা সাচ্চা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে এই বিদেশী চাপ

এড়াইতে হইবে, আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে দেশী রূপের দেশী নামের দেশী ভাবের দেশী ভাষার। বাঙ্গালীকে শিখিতে হইবে বাঙ্গলার ভাবের মধ্য দিয়া, আর ভাব যতখানি না হয় তাহার বেশী বাঙ্গালীর ভাষার মধ্য দিয়া, কারণ, ভাষা স্বদেশী হইলে ভাব আপনা হইতেই স্বদেশী হইয়া উঠে। মাতৃস্তন্যের সাথে যে-ভাষা আমার মুখে লাগিয়া আসিয়াছে তাহা দিয়াই ত জগৎ চিনিয়াছি, জগতের সাথে জাগ্রত সম্বন্ধ আর কিসের সহায়ে সম্ভব ?

শিক্ষা-সংস্কারের গোড়ায় যাঁহারা vernacular medium অর্থাৎ দেশভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের এই-সকল কথা যে খুবই সত্য তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু তবুও আমাদের মনে হয় এ সত্য অনেকখানি উপরকারই সত্য, ইহা সমস্যাটির একেবারে মূলে যাইয়া পৌঁছায় নাই। কারণ, ভাষা মানুষের বাহিরের জিনিষ আর ভাষা যতখানি ভাবের সৃষ্টি করে তাহাও মানুষের বাহিরেরই। কিন্তু মানুষের যদি কিছু পরিবর্ত্তন হয় তবে তাহা বাহির হইতে ভিতরে নয়, ভিতর হইতে বাহিরে। আমাদের শিক্ষাজীবন যে কৃত্রিম তাহার কারণ বিদেশী ভাষা বিদেশী ভাব ততখানি নয়, তাহার কারণ এই যে আমাদের ভিতরে আমাদের অন্তরাত্মায় পূর্ব্ব হইতেই একটা কৃত্রিমতা বা তাহার বীজ ঢুকিয়াছিল। মানুষটাই আগে কৃত্রিম ছিল, তাই সবই তাহার কৃত্রিম হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বিদেশী ভাষা বিদেশী ভাব

এই কৃত্রিমতাকে সুবিধা দিয়াছে, স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহাকে ঠিক সৃজন করে নাই। আমাদের আরও মনে হয় ভিতরে যদি আমরা সাচ্চা থাকিতাম তবে বিদেশী ভাব ও বিদেশী ভাষার মধ্যেও সে সাচ্চাভাব ফুটিয়া উঠিত। খৃষ্টের কথা ভুল নয়—There is nothing from without a man, that entering into him can defile him but the things which come out of him, those are they that defile the man. মানুষের অন্তরে গিয়া মানুষকে কলুষিত করিতে পারে এমন কোনো কিছুই বাহিরে নাই, কিন্তু মানুষকে যাহা কলুষিত করে তাহা তাহার অন্তর হইতেই বাহির হইয়া আসে।

ইংরাজী শিক্ষার পূর্ব্বেও স্বদেশী ধরণের যে একটা unreality কৃত্রিমতা আমাদের শিক্ষায় সাধনায় ছিল তাহার কিছু পরিচয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় একদিন দিয়াছিলেন।* স্বদেশী বলিয়া তাহা আমাদের যতখানি প্রাণের ভিতরকার জিনিষ ছিল আর ঠিক ততখানিই ছিল তাহা ভয়াবহ। যখন 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই বাক্যের 'অথ' শব্দটির ব্যাখ্যা দিতে আমরা কেতাবের উপর কেতাব লিখিয়া ফেলিলাম, 'তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল' এই বিপুল সমস্যাটি লইয়া দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর মাথা ঘামাইতে লাগিলাম—তখন যে আমাদের খুব জোর কাণ্ডজ্ঞান ছিল তাহা সাহস করিয়া বলিতে

* "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার"

পারি না। সুতরাং যে দোষের জন্য আধুনিক শিক্ষার উপর আমরা চটিয়া যাইতেছি সে দোষ আমাদের সুপ্রাচীন, আমাদের অস্থিমজ্জায় তাহা মিশিয়া আছে, আর এই জন্যই তাহা আমাদিগকে আজ এতখানি পাইয়া বসিতে পারিয়াছে।

এ দোষ সুপ্রাচীন—প্রথমে আমরা ইতিহাসের দিক দিয়া এ জিনিষটি একটু দেখিব। Dreamy East স্বপ্নবিলাসী বলিয়া আমাদের একটা অপবাদ আছে—স্বপ্ন অর্থাৎ আকাশকুসুম দেখা, বস্তুজগৎ জাগ্রতজীবন—real, concrete—ছাড়িয়া ভাবের নেশায় তর্কের চটকে মস্‌গুল হইয়া থাকা জিনিষটা আমাদের ধাতুগত হউক বা না হউক একদিন যে উহার প্রভাবে আমরা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই, আর তাহারই জের আজও আমরা টানিতেছি। বৈদিক যুগে, রামায়ণের যুগে, মহাভারতের যুগে যে শিক্ষাদীক্ষা—culture—আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, তাহা ছিল—বস্তুতন্ত্র না-বলিতে চাও—বাস্তবমূলক। সে শিক্ষাদীক্ষার মূলে প্রথম ঘা দিল কুরুক্ষেত্র। দেশের ক্ষাত্রশক্তি যে দিন নির্ম্মূলপ্রায় হইল, সে দিন হইতে আমাদের প্রাণ লইল এক নূতন ধারা, আমাদের জীবনের উপর পড়িল এক নূতন ছায়া। কুরুক্ষেত্র যে আনিয়া দিল ধর্ম্মের রাজ্য, ব্রাহ্মণ্যের ভাব, তাহার প্রয়োজন তাহার উপকারিতার কথা শতমুখে স্বীকার করিয়াও আমরা বলিব সে ব্রাহ্মণ্য আসিল ক্ষাত্রপ্রতিভাকে নির্বীর্য্য করিয়া, সে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল কর্ম্মকে খাট করিয়া একটা

অবসাদের উপর। কুরুক্ষেত্র না হইলে আমরা ইউরোপের মত অতিমাত্র বস্তুতন্ত্র, ইউরোপ হইতেও একটা বিকট অসুর হইয়া পড়িতাম কি না, ভারতের গৌরব দিব্য আধ্যাত্মিক সম্পদকে অটুট রাখিতে পারিতাম কি না—এ প্রশ্ন আমরা তুলিতেছি না। মন্দের অন্তরে যেমন ভালর বীজ থাকে, সেই-রকম ভালর অন্তরেও মন্দের বীজ থাকে—আমরা সেই কথাই বলিতেছি। কুরুক্ষেত্রের পর ভারতের কর্ম্মাত্মক বুদ্ধি ও তাহার বিষয়ানন্দের উপর দ্বিতীয় বার আঘাত করিলেন ভগবান বুদ্ধ—বৌদ্ধদিগের সন্ন্যাসধর্ম্ম ভারতীয়-আত্মাকে এ জগৎ এ জীবন হইতে সরাইয়া আর এক স্তরে তুলিয়া ধরিল। আর সকলের শেষে আসিলেন শঙ্কর তাঁহার মায়াবাদ লইয়া—the most unkindest cut of all—এ অস্ত্রে তিনি বাস্তবসত্যের সহিত অন্তরাত্মার সত্যের যে ক্ষীণ নাড়ীর বাঁধনটুকুও ভারতের সাধনায় ছিল সেইটুকুও ছিন্ন করিয়া দিলেন। তখন হইতে অক্ষরব্রহ্ম লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম, ক্ষরও যে ব্রহ্ম সে কথা ত ভুলিয়া গেলামই, শিখিলাম এ জিনিষটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া কোন-রকমে নাকচ করিয়া দিতে।

ভারতের আত্মশক্তি এই যে বাহির হইতে ক্রমে ক্রমে আপনাকে ভিতরের দিকে গুটাইয়া লইতেছিল, অন্তঃপ্রজ্ঞাকে প্রবুদ্ধ করিতে যাইয়া বহিঃপ্রজ্ঞাকে ক্ষুণ্ণ ক্ষিণ্ণ করিয়া আনিতে-ছিল—এই ধারা, এই গতির সহায় হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল বিদেশীর চাপ—পরাধীনতা। কর্ম্মজীবনের দায়িত্ব যতই আর

একজন নিজের উপর লইতে আরম্ভ করিল, প্রাণশক্তির ক্ষেত্র যতই আমাদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল ততই সে ক্ষতিটুকু পূরণ করিয়া লইবার জন্যই যেন—আমরা জোরে অন্তর্জগতের ক্ষেত্র আঁকড়িয়া ধরিতে লাগিলাম। চক্ষু মেলিয়া দেখিতে আর আমরা পাই না, তাই চেষ্টা করিলাম চক্ষু বুজিয়া কি দেখা যায় তাহা দেখিতে। চক্ষু বুজিয়া যে দেখা যায় না তাহা নয়, কিন্তু যে চক্ষু বুজিয়া আছে অবসাদের ফলে বা বাহিরের জবরদস্তির বলে সে চক্ষু দিয়া নয়।

আমরা এমন বলিতে চাই না যে সমস্ত ভারতবর্ষ কর্ম্মবিমুখ ধ্যানী হইয়া উঠিয়াছিল অথবা জীবনসৃষ্টির আনন্দ তাহার একেবারেই লোপ পাইয়াছিল।—না, তাহা নয়। ভারতের মত মহাপ্রাণসত্তার মধ্যে—তাঁহার তামসিক অবস্থা, অবসাদের যুগেও যে মাঝে মাঝে বিপুল একটা কর্ম্মের জাগ্রতজীবনের তরঙ্গ মাথা তুলিয়া উঠিবে ইহা আশ্চর্য্যের কিছু নয়, অথবা উহার একটা ক্ষীণ ফল্গুস্রোত বরাবর কোথাও না কোথাও প্রবাহিত থাকিবে তাহাও স্বাভাবিকই বলিতে হইবে। কিন্তু কথাটা এই মোটের উপর ভারতের অন্তরাত্মার দিক দিয়া দেখিলে দেখিতে পাই সে অন্তরাত্মার উপর পরলোকের, আর-জগতের ছাপটাই ক্রমশঃ গভীরতর হইয়া উঠিয়া ইহলোকের এ জগতের চিহ্নকে মুছিয়া চলিয়াছে; সংসারের কাজ করিয়াও সে সংসারকে হেয় জ্ঞান করিয়াছে, সংসারের আনন্দটুকু তেমন সহজ সরলভাবে লইতে ভুলিয়া চলিয়াছে। ইউরোপের অভিব্যক্তির ধারার সহিত

উহার তুলনা করিলেই এ কথাটা বোধগম্য হইবে। ইউরোপের ধারা আদর্শ কি না, সে প্রশ্ন আমরা তুলিতেছি না। অমৃত না পাইলে কেবল বিত্ত দিয়া কি করিব?—সত্য কথা। কিন্তু অমৃতের জন্য বিত্তকে যে মায়ামোহ মতিভ্রম নরক প্রভৃতি আখ্যা দিয়া গালাগালি দিতে হইবে এমন কোন প্রয়োজন নাই। কৌশল জানিলে—কর্ম্মসু কৌশলম্—বিত্তই বস্তুই অমৃতের রসদ জোগাইয়া দেয়।

এখন আমাদের মোট বক্তব্য এই, আমাদের আধুনিক শিক্ষা দাঁড়াইয়াছে দেশের মজ্জাগত এই-রকম একটা অতিমাত্র অমুত্র-মুখীন ভাবকে প্রতিষ্ঠা করিয়া। কর্ম্মকে মুক্তির অন্তরায় বলিয়া, আমরা কর্ম্মকে ক্ষয় করিতে—অর্থাৎ ফলতঃ কর্ম্মকে ফাঁকি দিয়া চলিতে শিখিয়া উঠিয়াছি, মগজের মধ্যে কূটতর্কের অস্ত্র শাণিত করিয়া তুলিয়াছি, জগৎসমস্যার মীমাংসার জন্য অথবা সকল বুদ্ধি সকল কর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া ভাবুকতার চিত্তাবেগের উল্লাসে নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইয়া শেষে বেহুঁস হইয়া পড়িয়াছি—দেশের এই রকম যখন আবহাওয়া তখন তাহার মধ্যে যে-শিক্ষা বা দীক্ষা গজাইয়া উঠিবে তাহা যে ঝুটা হইয়া পড়িবে, ইহা ত আশ্চর্য্যের নয়। বিদেশীর খোলসে এই মেকি শুধু আমাদের নজরে পড়িয়া গিয়াছে, স্বদেশী পোষাকে তাহাকে চিনিতে পারি নাই, এই যা পার্থক্য।

সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া আমরা এখন বাঙ্গলার কথা কিছু বলিব। কারণ, আমাদের মনে হয়, শিক্ষার এই যে

কৃত্রিমতা ইহা বাঙ্গালীর মধ্যে যেমন দেখা দিয়াছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঠিক তেমনটি হয় নাই। তা ছাড়া বাঙ্গালীর কৃত্রিমতাতে একটা বিশেষত্ব আছে। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে বাঙ্গালী ত জগৎকে কর্ম্মকে কোন দিন তেমন নাকচ করিয়া দিতে পারে নাই, বাঙ্গালীর শক্তিপূজা বাঙ্গলার বস্তু, শক্তিসাধক হইয়া তবে বাঙ্গালী বস্তুর জ্ঞান এমন করিয়া হারাইল কি পাপে? ইহার উত্তর—বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা। কর্ম্মের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী শক্তির আবাহন করে নাই, সে করিয়াছে চিত্তাবেগের মধ্য দিয়া। শক্তির সাধনা করিতে যাইয়া সে 'মা মা' করিয়া কাঁদিয়া গলিয়া গিয়াছে।

এই অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতার জন্যই সে বিদেশীর দিকে এমন সহজে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আমরা মুসলমানযুগের কথা কিছু বলিব না; ইংরাজের পাশ্চাত্যের প্রভাব বাঙ্গালীর প্রাণের উপর যেমন শীঘ্র শীঘ্র ও অবলীলাক্রমে পড়িয়াছে ও বিস্তৃত হইয়াছে, ভারতে তেমন কোথাও হয় নাই। বাঙ্গালী যেমন ইংরাজ সাজিয়া উঠিতে পারে, আর কেহ তেমন পারে না। ইহাতে সে তাহার প্রাণের নমনীয়তা, তরলিত অবস্থারই পরিচয় দিয়াছে। ভাবপ্রবণতা প্রাণের তরলতা চঞ্চলতা ধায় নিত্য-নূতন আকর্ষণের দিকে, বাঙ্গলাকে সজাগ সক্রিয় সরস রাখিবার জন্য সে চায় নিত্য নূতন উত্তেজনা; নূতনের সাথে তাই সে এমন সহজে পটিয়া যায়—সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বমাহুঃ তাহার পক্ষে অতিমাত্র সত

এখন, প্রাণের এই উদ্বেলতা, এই চিত্তাবেগের, এই ভাববিমুগ্ধতার একটা সহজ পরিণাম বা প্রকাশের ধারা কি? তাহা হইতেছে বাগ্‌বহুলতা—কথা বলিবার আনন্দ। ফলতঃ বাঙ্গালী ইংরাজের প্রতি অনুরক্ত হয়, ইংরাজের সাহিত্য ইংরাজের ভাষার মধ্য দিয়া। ইংরাজের ভাষার মধ্যে 'বাক্'এর মধ্যে যে সৌন্দর্য্য যে নূতনত্ব দেখিয়াছে, বাঙ্গালীর প্রাণে তাহাই গিয়া সকলের আগে আঘাত করে, আর উহা হইতেই তাহার ভাবের রাজ্যে জীবনের ক্ষেত্রে যা-কিছু পরিবর্ত্তন অনুরঞ্জন আসিয়াছে। বোম্বাই-অধিবাসীরা বাঙ্গালীর মত নয়, তাহাদের বস্তুজ্ঞান কিছু আছে, তাই ইংরাজের কাছ হইতে সে প্রধানতঃ লইয়াছে ব্যবসা-বাণিজ্য—পলিটিক্স, এই দিক দিয়াই ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষাকে সে দেখিয়াছে। মান্দ্রাজী যে ঠিক কোন্ দিক দিয়া দেখিয়াছে, বলিতে পারিলাম না, তবে অন্ততঃ সাহিত্যের দিক দিয়া নয়। বাঙ্গালীরা কিন্তু জাতসাহিত্যিক, অর্থাৎ কথা লেনা-দেনা করাই তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্মজীবন; ইংরাজকে সে এই দিক দিয়াই ধরিয়াছে, চিনিয়াছে।

প্রত্যুত বাঙ্গালী যে কথায় দড়, এটা ত প্রবাদবাক্য হইয়া উঠিয়াছে—বাঙ্গালীরা ভূমিষ্ট হইয়াই বাগ্মী। তা ছাড়া বাঙ্গলা সাহিত্যও ইহার প্রমাণ। শব্দের আড়ম্বর, বাক্যের ঝঙ্কার—শুধু কথার উপর কথা দিয়া কথা সাজান, ইহাই বাঙ্গলা সাহিত্যের বেশীর ভাগ। অর্থকে সুস্পষ্ট করিয়া তোলা নয়, অনুভূতিকে উপলব্ধিকে জাগ্রত করিয়া ধরা নয়—বাঙ্গালী

চাহিয়াছে ভাষার চটক—'কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি'। প্রাচীনেরাও বাঙ্গালীর এই ধাত ধরিতে পারিয়াছিলেন—তাই গৌড়ীয়রীতির প্রসিদ্ধি। গৌড়ীয়রীতি অর্থ শব্দাড়ম্বর, বাগ্‌বৈখরী। মধুসূদন গৌড়জনের জিহ্বার জন্যই তাঁহার বিপুল বাক্‌-সাগর গড়িয়াছিলেন। কথা খেলাইয়া কিরূপে বাহাদুরী দেখাইতে হয়,—শব্দের কলাকৌশলেই কি রকমে মন মুগ্ধ করিতে হয়, তাহার নিদর্শন—যদি বাঙ্গলা সাহিত্যের গোড়ায় যাই, দেখুন বিদ্যাপতি; যদি একেবারে আজকালকার দিনে আসি, দেখুন তবে সত্যেন্দ্রনাথ।

বস্তুর সাথে বাঙ্গালীর সাক্ষাৎপরিচয় নাই, বস্তুর একটা নাম দিতে পারিলেই সে সন্তুষ্ট। নামেই সে জিনিষকে চিনিতে পারে, নাম ব্যতীত জিনিষ তাহার কাছে অস্পষ্ট অবোধ্য। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে মানুষের যে ইন্দ্রিয়টি প্রধান, সেই অনুসারে তাহার একটা শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে—যেমন, visual, auditory প্রভৃতি type অর্থাৎ দর্শনপ্রধান, শ্রবণপ্রধান শ্রেণী। ইহার মধ্যে বাঙ্গালীকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—verbal type বচনবাগীশ বলিয়া। অর্থাৎ, কোন জিনিষকে বুঝিতে উপলব্ধি করিতে হইলে একশ্রেণীর লোকের চাই সে-জিনিষের একটা রূপ, একটা মূর্ত্তি, চোখের সম্মুখে যাহাকে ধরা যায়; তত্ত্ব বুঝাইতে বা বুঝিতে হইলেও ইহাদের প্রয়োজন সে তত্ত্বের একটা বাহ্যপ্রতিমা—ইহারাই দর্শনপ্রধান visual typeএর। আর এক শ্রেণীর আছেন যাঁহারা জিনিষ

বুঝেন, ধরণীর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার সহায়ে (auditory type), আবার এমনও আছেন যাঁহাদের চাই গন্ধের ঘ্রাণের ইঙ্গিত (olfactory type). কেহ বুঝে চক্ষু দিয়া, কেহ বা কান দিয়া, কেহ বা নাসিকা দিয়া; বাঙ্গালী কিন্তু বুঝে জিহ্বা দিয়া—দর্শন নয়, জিঘ্রণ নয়, শ্রবণও নয়, তার চাই কথন বা নামকরণ।

জিনিষকে দেখিয়া শুনিয়া নয়, ধরিয়া ছুঁইয়া নয়, বাঙ্গালীর কাছে জিনিষের পরিচয় জিনিষের নামে; জিনিষের সাথে জিনিষের সম্বন্ধ নয়, কিন্তু জিনিষের নামের সাথে জিনিষের নামের সম্বন্ধ গড়িয়াই বাঙ্গালী তাহার জগৎ গড়িতে চায়। পাশ্চাত্য কবির কথা—

What's in a name? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet—

বাঙ্গালী স্বীকার করিয়া লইতে ইতস্তত: করিবে—তার নিজের কবি হাতে কলম লইয়াই শ্রীরাধিকার মুখ দিয়া প্রথম কথা বলাইয়াছেন—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

* * *

শ্যাম নামে আছে কত মধু গো—

নামের মহিমা বাঙ্গালী—এমন কি কম-বেশী সমগ্র ভারতবর্ষ—

যে কতখানি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে তাহার পরিচয় আমাদের দেবতাদের শতনামে সহস্রনামে; যে দেবতাকে যত নাম দিতে পারি সে দেবতা যেন তত জাগ্রত; তাহাকে যেন তত স্পষ্ট বুঝি।

বাক্য কথা নামের প্রয়োজন আছে—জ্ঞানের, বস্তুজ্ঞানেরই সাথে উহাদের যে একটা ঘনিষ্ঠ, একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু নাম জিনিষের পরিচয় হইলেও, নামই জিনিষ নয়। এ পার্থক্যটি স্বতঃসিদ্ধ হইলেও, কার্য্যতঃ ইহাকে আমরা সহজেই ভুলিয়া যাই; কোন জিনিষের উপর একটা নামের ছাপ দিতে পারিলেই, আমরা মনে করি জিনিষটির সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি, জিনিষটিই ধরিয়াছি। এই রকমেই জিনিষকে বস্তুকে ভুলিয়া একদিকে সরাইয়া রাখিয়া তাহার ছায়াটি লইয়া থাকি, ছায়া লইয়াই কারবার করি। এই রকমেই verbalismএর অবশ্যম্ভাবী ফল unreality. এই জন্যই আমাদের নৈয়ায়িকেরা পণ্ডিতেরা কাণ্ড-জ্ঞান না থাকাকেই দার্শনিকত্বের পাণ্ডিত্যের লক্ষণ মনে করেন, এই জন্যই আমাদের কবিরা সাহিত্যিকেরা জাগ্রত উপলব্ধি (concrete realisation) হইতে দূরে দূরে থাকেন, আর এই জন্যই আমাদের 'পলিটিসিয়ান্'রা বিশ্বাস করেন সভা করিয়া বক্তৃতা দিয়া—'agitation' করিয়াই দেশ উদ্ধার হইবে। আমাদের ছাত্রেরা ত সমষ্টির এই ধাতু এই mentalityই লইয়া আসিয়াছে।

আমাদের শিক্ষা

আমাদের বাঙ্গালীর শিক্ষা যে মেকি হইয়া পড়িয়াছে তার কারণস্বরূপ পিছনে আছে আমাদের জীবনসাধনার এই তিনটি ধারা বা গতি; জীবন হইতে, কর্ম্ম হইতে, বাস্তব হইতে, যে আমরা বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছি তার প্রথম কারণ, পৃথিবীকে দেহকে হীন মনে করিয়া শুধু স্বর্গের দিকে, নির্গুণ আত্মার দিকেই পলাইয়া যাইবার ইচ্ছা; দ্বিতীয় কারণ, চিত্তাবেগে ভাব-বিক্ষোভে একটা নেশার স্বপ্নের জগৎ সৃজন করিয়া তাহারই মধ্যে ডুবিয়া বিভোর হইয়া যাওয়া; তৃতীয় কারণ, জিনিষের অপেক্ষা কথার উপর অতিরিক্ত টান। এই তিনে মিলিয়া আমাদের অন্তরাত্মাকে আমাদের ভিতরের দীক্ষাকে ঝুটা করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া, বিদেশী ভাব বিদেশী ভাষা এমন সহজে সেই অন্তরাত্মার প্রকাশ সকল প্রতিষ্ঠানকে, সেই দীক্ষার আধার সকল শিক্ষাকে আরও মেকি আরও অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিতে পারিয়াছে।

সুতরাং শিক্ষার ধারাকে বদ্‌লাইতে শোধ্‌রাইতে হইলে আগে প্রয়োজন ঐ ভিতরের তিনটি ধারাকে বদ্‌লান শোধ্‌রান। ইউনিভার্সিটিতে যাঁহারা ইংরাজীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা প্রচলন করিতে চাহেন, তাঁহারা যদি ঐটুকু করিয়াই নিশ্চিন্ত হন তবে বিশেষ ফল যে হইবে এমন আমরা আশা করি না। তখনও এখন যাহা করি তাহাই করিব, তবে ইংরাজীর বদলে বাঙ্গলায় ওগ্‌রাইব, এই যদি পার্থক্য হয়। এমনও যদি বলি যে খাঁটি বাঙ্গলায়, বাঙ্গালীর বাঙ্গলায় শিক্ষা দিতে হইবে, সংস্কৃত বাঙ্গলা

ইংরাজীর মতনই আমাদের কাছে ঝুটা—কিন্তু তাহা হইলেও যে আমাদের বস্তুজ্ঞান হইবে বা বাড়িয়া যাইবে এমনও জোর করিয়া বলা যায় না। ভিতরে যদি sense of reality সত্যজ্ঞান না জাগে তবে সাদা সহজ কথাও সেই মিথ্যা মেকিকেই প্রকাশ করিবে। আগে ঐ ভিতরের জিনিষ; সেখানে যদি আমরা সত্য হইয়া উঠিতে পারি তবে বিদেশী ভাব বা বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়াই সে সাচ্চা ভাব ফুটিয়া উঠিবে। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে দেশী বাঙ্গালীর ভাব ও ভাষা বাঙ্গালীর সত্য ভাবকে জাগাইয়া ধরিবার পক্ষে একটা সহজ সহায়—কিন্তু আমাদের মতে সেটি গৌণ কথা, সেটা আগের গোড়ার কথা নয়।

বাঙ্গালীর সমগ্র সত্তাটি ধরিয়া নাড়িয়া দিতে হইবে—জগতের সাথে তাহার যে-রকম সম্বন্ধ, যে-ধরণে তাহার আদানপ্রদান, সেটিকে বদ্‌লাইয়া দিতে হইবে। কথার পরিবর্ত্তে কর্ম্মের ভিতর দিয়া তাহাকে জগৎ চিনিতে হইবে; জিনিষের নাম শুনিয়া—নাম বলিয়া নয়, জিনিষকে হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া পরখ করিতে হইবে। জিহ্বা ও কণ্ঠের উপর যে চাপ সে দিয়া বসিয়াছে সেটিকে সরাইয়া ছড়াইয়া দিতে হইবে সকল অঙ্গের মাংসপেশীর উপর—অন্য কথায়, verbal typeকে চালাইয়া লইতে হইবে kinæsthetic typeএর মধ্যে, শিখিতে হইবে কাজ করা—হাত-পায়ের ব্যবহার করা। গতর খাটাইয়া, কপালে ঘাম ঝরাইয়া by the sweat of the brow—যে কেবল অন্ন জুটাইতে হয় তাহা নয়, জ্ঞান সঞ্চয়েরও এই পন্থা।

এই রকমেই জগৎ জিনিষ বাস্তব, সত্য জাগ্রত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে, এই রকমেই নামের পিছনে যে বস্তু তাহা সাক্ষাৎগোচর হয়, ভাবও থিতাইয়া জমিয়া অর্থকেই শরীরী করিয়া তোলে।

কিন্তু তাই বলিয়া এমনও আমাদের বিশ্বাস নাই যে কিণ্ডার-গার্টেন পদ্ধতিই শিক্ষা-সংস্কারের সেই মহৌষধ—চাষীরা কি করিয়া ধান কাটে স্কুলের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া অভিনয় করিলে, কুকুর কিরূপে ডাকে তাহার অনুকরণে ঘেউ ঘেউ করিলে বস্তুজ্ঞান আমাদের শিশুদের হইবে; অথবা বই পড়ার সাথে practical class, lectureএর সাথে seminar-work যোগ করিয়া দিলেই আমাদের শিক্ষা real হইয়া উঠিবে; তাহা নহে। শিক্ষাকে বাস্তব করা অর্থ সমস্ত জীবনের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সাথে উহাকে মিলাইয়া গাঁথিয়া ধরা। শিক্ষা হইবে জীবনের বিকাশ, প্রস্ফুটন, পরিণতি; জীবনের—Lifeএর যে চক্ষু ফোটা, তাহারই নাম শিক্ষা। আমাদের ছাত্র-দিগকে এই জীবন হইতে কাটিয়া পৃথক করিয়া একটা কৃত্রিম hot-house বা অচলায়তনের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। বাহিরের জগতের জীবনের সাথে তাহাদের আদান-প্রদান নাই, তাহাদের নিজেদের ভিতরেও একটা জীবন পরিকল্পনা নাই। প্রাচীন গ্রীক যুবকের স্কুল ছিল ব্যায়ামস্থান, স্নানাগার, উৎসব-প্রাঙ্গন, ভ্রমণ-উদ্যান—হাট বাট মাঠ; আর সেই সঙ্গে নাগরিক জীবনের কর্ম্মায়তন সব। প্রচীন রোমেও ছিল তাই। আধুনিক ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যেও শিক্ষাকে এই-রকম

শিক্ষা ও দীক্ষা

একটা জীবন-তরঙ্গে, বাহিরের চারিদিকের সাথে একটা জাগ্রত সম্বন্ধে সঞ্জীবিত পরিপুষ্ট করিয়া রাখিবার প্রয়াস দেখিতে পাই। আর আমাদের প্রাচীন আরণ্যক যুগের ভারতেও এই ধরণের একটা জিনিষ ছিল তাহার নিদর্শন পাই। জিজ্ঞাসু আসিয়াছেন ঋষির কাছে ব্রহ্মবিদ্যার কথা জানিতে, ঋষি তাঁহাকে গরু চরাইতে বলিয়া দিলেন।* আমরা ইহাতে মাষ্টারের বেগার-খাটা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারি; কিন্তু জিনিষটি যে এক সময়ে ছিল একটা শিক্ষাপদ্ধতিরই অঙ্গ, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

খাঁটি শিক্ষা যাহা, চিরকালই তাহা হইতেছে হাতে-কলমে শিক্ষা। জীবনব্যাপারের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জিনিষকে হাতে করিয়া নাড়িয়া ছানিয়া চলিতে চলিতে মনে যে-সব সমস্যা যে-সব সমাধান হইতে থাকে, মনে যে-সব ভাব যে-সব চিন্তা উদয় হয় তাহাদিগকে জীবন-ব্যাপারের জিনিষের উপর ফেলিয়া ফলাইয়া যে নব নব ভাবের চিন্তার সৃষ্টি হইতে থাকে—তাহা লইয়াই শিক্ষা; প্রকৃত শিক্ষা অন্য রকমে হয় না। শিক্ষার মধ্যে আছে তিনটি স্তর বা সোপান। জীব-আধারের যেমন আছে পঞ্চকোষ, তেমনি আমরা বলিতে পারি, শিক্ষার আছে তিনটি কোষ। প্রথম, কথা—বাক্য; এটি শুধু বহিরাবরণ, স্থূল আশ্রয় অবলম্বন। দ্বিতীয়, অর্থ—ভাব; কথা চাহিতেছে এই ভিতরের অর্থকে ভাবকে প্রকাশ করিতে,

* সত্যকাম-জাবাল সংবাদ— ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

ধরিয়া দিতে। কিন্তু এই ভিতরেরও ভিতর আছে, সেটি শিক্ষার তৃতীয় পাদ—উহা হইতেছে প্রাণের অনুভূতি, অন্তরাত্মার উপলব্ধি। আমাদের শিক্ষা শিখায় শুধু কথা—'হ্যাম্‌লেট্‌'এর—'words, words, words'; কোথাও কোথাও দুইচারিজন সাধকের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের আভাস বা ছায়া দেখা যায়। কিন্তু আমাদের শিক্ষা তৃতীয় স্তরে উঠিতে পারে নাই। প্রকৃত শিক্ষা, সজীব শিক্ষা কিন্তু হইতেছে তাহাই, যাহা প্রাণের প্রয়োজনের সাথে সাথে, অন্তরাত্মার জিজ্ঞাসার ধারা অনুসারে রচিত হইতেছে বিকশিত হইতেছে।

আর জীবনের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সহিত অন্তর পুরুষের তত্ত্বসাধনার, দেহের গতির সহিত আত্মার ছন্দের, আছে একটা নিবিড় অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ—একের মধ্যে একের সহায়ে অপরটি উপচিত জাগ্রত সুঠাম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া উঠে। শিক্ষাও এক রকম অধ্যাত্মবিদ্যাই। অধ্যাত্মবিদ্যায় যেমন—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনীয়া
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন—

সেই রকম শিক্ষাও পরিপূর্ণ হয় না কেবল মনের বুদ্ধির বিচারের স্মৃতিশক্তির কসরৎ করিয়া। অধ্যাত্মবিদ্যাতেও চাই যেমন অনুষ্ঠান ক্রিয়া, শিক্ষাতেও চাই সেই রকম এক অনুষ্ঠান ক্রিয়া—সমস্ত জীবনের আয়তনের মধ্যে ফেলিয়া আধারকে রূপ দেওয়া, শাণিত করিয়া তোলা।

তাই বলিয়া কেহ ভুল বুঝিবেন না যে আমাদের এই শিক্ষার

আদর্শ হইতেছে লোকায়ত প্রাকৃত materialistic utilitarian—আদর্শ অথবা abstruse, abstract জিনিষকে, তর্ক বা বহুশ্রুতিমাত্রকেই শিক্ষাব্যবস্থা হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাই। এমন-কি তর্কের জন্যই তর্ক, চিন্তার জন্যই চিন্তা, পড়ার জন্যই পড়া যে আমরা চাই না, সে ধরণের pragmatic—চরমপন্থী বস্তু-তান্ত্রিক বা কর্ম্ম-তান্ত্রিক আমরা নই। আমরা এমন বলি না প্রত্যেক চিন্তাকে কর্ম্মের মধ্যে, প্রত্যেক ভাবকে শক্তি-প্রয়োগের মধ্যে, নামকে স্থূল বস্তুর মধ্যে রূপান্তরিত করিয়া ধরিতে দেখিতে হইবে, যে চিন্তা যে ভাব বা যে কথাকে এ রকমে স্থূলরূপে পাই না, তাহা অমূলক নিরর্থক। ধ্যানের জিনিষকে ধ্যান দিয়া মনের জিনিষকে মন দিয়াই মুখ্যতঃ পাইতে হয়। কিন্তু কথাটা তাহা নয়, কথাটা হইতেছে এই 'পাওয়া', উপলব্ধি করা (realisation); যে জিনিষকে আমরা 'পাই', উপলব্ধি করি, তাহা চিরকালই 'বস্তু', তবে সে বস্তু যে স্থূল বস্তুই হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। সমস্ত প্রশ্নটি হইতেছে উপায়, প্রণালী (method) লইয়া; কি ভঙ্গীতে আমরা শিক্ষা করিতেছি।

সকল জিনিষের—স্থূল বস্তু হউক, আর তত্ত্ব হউক, abstract হউক আর concrete হউক—সকলেরই আছে দুইটা দিক বা ভাগ, একটা খোসা আর একটা সার; আর, জিনিষকে ধরি যে-বৃত্তি দিয়া, শিক্ষার যন্ত্র আমাদের সেই মনেরও আছে দুইটা দিক, তাহারও খানিকটা খোসা আর খানিকটা সার। ভুল

শিক্ষা—unreal শিক্ষা হইতেছে তখন যখন মনের খোসা-ভাগ দিয়া জিনিষ ধরিতে যাই—তখন আমরা জিনিষের খোসাকেই শুধু ধরিতে পারি ; প্রকৃত শিক্ষা—real শিক্ষা হইতেছে তখন যখন মনের সার ভাগ দিয়া জিনিষের সার ভাগ ধরি। মনের সার ভাগ দিয়া ধরার নামই 'পাওয়া' বা উপলব্ধি, এই হিসাবেই আমরা শিক্ষাকে অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়াছি।

স্থূল অঙ্গচেষ্টা, কর্ম্মে নিয়োগ, জীবনের উপর দখল আমাদের এই উপলব্ধি করার—মনের সার-ভাগ দিয়া দেখার বৃত্তিকে সজাগ করিয়া তোলে ; স্থূলচক্ষু দিয়া যে ভঙ্গীতে আমরা দেখিতে অভ্যাস করি, অন্তরাত্মা দিয়াও আমরা সেই ভঙ্গীতেই দেখিতে শিখি। আমাদের মনে হয় physical sense of reality যাহার মধ্যে অস্ফুট, তাহার intellectual sense of reality এমন কি spiritual sense of reality'ও মলিন হইয়া উঠে। শঙ্করাচার্য্য নির্গুণ ব্রহ্মকে যে এমন জাগ্রতভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—মনে ও মতে (conscious mind) যাহাই থাকুক তাঁহার সেই আধ্যাত্মিক বস্তুতান্ত্রিকতা পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আশ্রয় পাইয়াছিল তাঁহার প্রাণের বিপুল কর্ম্মজীবনের একটা জের (যদিও unconscious) বস্তুতান্ত্রিকতারই ভিতরে।

শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে কর্ম্মৈষণার উপরে, মনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে জীবন-প্রেরণার উপরে। একটা বিপুল জীবনসামর্থ্য মুক্তপ্রাণের তেজ ব্যতিরেকে মন বুদ্ধি সমর্থ সতেজ সজীব হইতে পারে না। ফলতঃ, আমাদের শিক্ষায়

শিক্ষা ও দীক্ষা

আমাদের মনে রোগের বীজ ঢুকিল সেই দিন, যেদিন জীবনীশক্তি আমাদের হ্রাস হইতে আরম্ভ করিল; ক্ষাত্রতেজ যেদিন হীনপ্রভ হইল, সেদিন হইতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য প্রতিভাও আমাদের অন্তর্হিত হইতে লাগিল। জীবনের উদার সুগভীর মহাসাগর শুকাইয়া আসিল, সেখানে জাগিল ধূ ধূ বালুকারাশি আর এখানে ওখানে দুই একটি মৃতপ্রায় শ্লথগতি ক্ষীণ জলধারার রেখা। জীবনীশক্তি হারাইয়া মানুষ যেমন রোগের আধার হইয়া পড়ে, রোগের তাড়নায় সে যেমন কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া বসে, মাথামুণ্ড নাই কত রকম অমূলক চিন্তার, ভাবনার কল্পনার খেয়ালের পুঞ্জ মস্তিষ্কে গড়িয়া তোলে, স্নায়ুমণ্ডলীর ধারণাসামর্থ্য কমিয়া যাওয়াতে সামান্য জিনিষকে বিপুল করিয়া তোলে, বেদনা তাহার কাছে হয় যন্ত্রণা, হা-হুতাশ করিয়া মৃত্যুর জন্যই সে অপেক্ষা করিতে থাকে, আমাদের দেশগত সমষ্টির আধারটিও সেই রকমই হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাণশক্তি জীবনসামর্থ্য আমরা হারাইলাম, আমাদের জীবনপ্রতিষ্ঠানের সুসঙ্গতিও (balance) সেই সাথে নষ্ট হইল। কোথায় কি জিনিষ কতখানি কি ভাবে করিতে হইবে তাহার ঠিক-ঠিকানা কিছুই রহিল না।

মনের উৎকর্ষ চাই—বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ভাবের সরসতা চাই। কিন্তু উহাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে প্রাণের সামর্থ্যের উপর, জীবনের অখণ্ড আনন্দরাশির উপর; তবেই উহারা হইবে স্থির-প্রতিষ্ঠ, সুসংহত, সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'অগ্নিং ইলে পুরোহিতং'—অগ্নির আমরা বোধন করি, অগ্নি যাঁহার আসন সম্মুখে ঐ সর্ব্ব-

প্রথম, অগ্নি যিনি মূর্ত্তিমান জীবনের তেজ। এই অগ্নিই আর-সকল দেবতাকে ডাকিয়া আনিতেছেন, বাস্তব করিয়া তুলিতেছেন, অগ্নির তেজেই জাগিতেছে জ্ঞান বিজ্ঞান ইলা সরস্বতী।

মন আমাদের অসুস্থ, তাই শিক্ষায় আসিয়াছে অস্বাস্থ্য। মনকে সুস্থ স্বাস্থ্যপূর্ণ করিতে হইলে, চাই আমাদের সমস্ত জীবনটিকে সরস ও তেজোপূর্ণ করিয়া তোলা, চাই পূর্ণ জীবনের দেবতাকে জাগরিত করা। শিক্ষার গোড়ায় রহিয়াছে যে এই দীক্ষা সেইটি কি করিয়া পাই তাহাই হইতেছে আমাদের শিক্ষা-সংস্কারকদিগের দেখিবার বিষয়।

ফাল্গুন, ১৩২৬

শিক্ষার বনিয়াদ

ফরাসীদেশের বিখ্যাত খেলোয়াড় জর্জ্জ কার্পান্তিয়ে'র (Georges Carpentier) নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। বয়সে তরুণ হইলেও মুষ্টিযুদ্ধে ইনি সেদিন পর্যান্ত অদ্বিতীয় ছিলেন; শেষবারের লড়াইতে আমেরিকার ডেম্প্‌সী'র (Dempsey) কাছে শুধু হার মানিয়াছেন। কিন্তু হারাতেও তাঁহার প্রতিভা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, ডেম্প্‌সী তাঁহাকে হারাইয়াছেন ধারে নয়, কেবল ভারে। পাথরের স্তূপের কাছে মানুষ যদি হটিয়া যায়, তবে তাহাতে মানুষের বিশেষ অপমান নাই। সে যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য বিষয় তাহা নহে, আমাদের বক্তব্য বিষয় কার্পান্তিয়ে'র ব্যায়াম সম্বন্ধে উপদেশ। শরীরকে কি রকমে তৈয়ারী করিতে হয়, সে সম্বন্ধে এই প্রতিভাবান খেলোয়াড় নিজের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হইতে যে কথা বলিয়াছেন তাহা খুবই মূল্যবান বলিয়া আমরা মনে করি; সে কথা আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে যে কিয়দংশ হুবহু তুলিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"I have always made it a point to shun all exercises that are merely violent, for that which is physically hard to do, hurts and tires; it is

harmful. For instance, of the prolonged swinging of Indian clubs or dumb-bells or muscle-making exercises, I do not approve. A man who claims perfect physical fitness because his body is bunched with muscle, I would not pass as the ideal or perfectly trained athlete. The severely muscular man is strong only in a given test of strength; he may lift a tremendous dead-weight ; he is imposing to look at ; but he lacks elasticity, quick-footedness ; oftener than not he has an indifferent carriage ; he has made no special study of deportment. * * * I attach the utmost importance to 'how to walk'. Perfect carriage—the knowledge that you possess a full share of that poetry of movement which we call deportment has a wonderful effect upon the mind, and as I hold that it is absolutely necessary in the striving after physical fitness, first to have a regard for your mentality, I would put deportment down as the beginning of the alphabet of physical culture. Having learned to walk correctly, * * * you have mastered one of the hardest and most exacting lessons of your athletic curriculum ; you then know all about poise, balance ; and awkwardness will not seize hold of you. * * * Training as training—a species of mechanics I would call it—is as appalling as it is monotonous and soul-destroying. * * * It is not uncommon to find the

average trainer insisting upon his man working full steam until the very eve of a fight. There is nothing in my opinion, more harmful to drill into a pugilist that he is just a fighting machine to be wound up and set working at will."

কথা কয়টি সহজ সাধারণ কিন্তু অতি সারগর্ভ। দেশের শিক্ষা বিষয় লইয়া যাঁহারা নাড়া-চাড়া করেন তাঁহাদের সকলেরই এই কথা কয়টির উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। কার্পান্তিয়ে বলিতেছেন—শরীরকে তৈয়ার করিতে হইলে সকলের আগে শিক্ষা করা দরকার ঠিকভাবে হাঁটা। ঠিক ঠিক হাঁটিতে যে শিখিয়াছে, শরীরের চলনটি (deportment) যাহার বিশুদ্ধ, তাহারই শরীরের ভিত খাঁটি হইয়াছে; শরীরের পক্ষে আর যাহা প্রয়োজন তাহা আয়ত্ত করিতে সে ব্যক্তির কিছুই লাগে না। হাঁটিতে জানা অর্থ, ছন্দের তালমানের জ্ঞান; ঠিক হাঁটিতে পারে যে তাহার অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা সুর, সামঞ্জস্য, একটা হাল্‌কা অথচ আঁট-সাট ভাব। এইটি হইলে শরীরে স্বাস্থ্য সামর্থ্য সৌন্দর্য্য অতি সহজেই আসে। আমরা কিন্তু খোলা আকাশের বাতাসের আলোর সাথে সরল সহজভাবে ছন্দের তালে দোলাইয়া শরীরকে গঠিত করি না। আমরা কঠিন বিধিনিষেধের মধ্যে থাকিয়া, কষ্টসাধ্য ব্যায়াম করিয়া শরীরের উপর অত্যাচার করি মাত্র—বিশেষ বিশেষ মাংস-পেশী ফুলাইয়া, বিশেষ বিশেষ অঙ্গ পুষ্ট ও

শক্ত করিয়া ওস্তাদ বনিয়া যাইতে চাই। কার্পাস্তিয়ে তাই ডাম্বেল মুগুর ডন বৈঠক এইরকম কোন শ্রমসাধ্য ব্যায়াম-বিশেষে শক্তির পুঁজিকে খাটাইতে চাহেন না। তিনি বলেন এ-সব উপায়ে শরীরকে মাংসল পেশীবহুল করা যাইতে পারে, কোন কোন অঙ্গে প্রভূত বল সঞ্চয় করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? এইরকমে মানুষ বিশেষ কোন বল-পরীক্ষায় সফল হইতে পারে—কেহ বুকের উপর দিয়া হাতী চালাইয়া দিতে পারে, কেহ দশ-বিশ মণ পাথর তুলিয়া ধরিতে পারে, কাহারও বা বপুখানি দেখিয়া তাক লাগিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এখানে পাই না সমস্ত শরীরের একটা সাধারণ পুষ্টি, সমান সামর্থ্য, একটা সুবিন্যস্ত সুসংহত শক্তি, একটা ছন্দের সৌন্দর্য্য।

আমরা শরীরের শিক্ষার কথা বলিব না, আমরা বলিব মনের শিক্ষার কথা। কিন্তু শরীর সম্বন্ধে কার্পাস্তিয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সবই মনের সম্বন্ধেও প্রযুজ্য। আমাদের দেশে—শুধু আমাদের দেশেই বা কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে শিক্ষা প্রচলিত তাহা কার্পাস্তিয়ে যেমন বলিতেছেন সেই পেশীবহুল—severely muscular মন ও মস্তিষ্ক তৈয়ারী করিবার শিক্ষা। প্রচলিত শিক্ষায় আমরা করি কি? মনের এক-একটা খণ্ড-বৃত্তি ধরিয়া, মস্তিষ্কের এক-একটা ভাগের উপর ভর করিয়া আমরা কসরৎ করিতে থাকি। শিক্ষার্থীর মনকে মস্তিষ্ককে এক-একটা বিদ্যায় অর্থাৎ এক-একটা কৌশলে

(trick) কুশলী চতুর করিয়া তুলিতে চাই। রামমূর্ত্তি যেমন বুকের উপর জড়ান শিকল বুকখানা ফুলাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন, তেমনি আমাদের দার্শনিক ওস্তাদের উদ্দেশ্য তর্কের জোরে জগৎসমস্যা মিটাইয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া। তারাবাই যে-রকমে কয়েকগোছা চুলে বাঁধিয়া বিপুল ভারী পাথর তুলিতে পারেন, সেই-রকম জবরদস্ত স্মৃতিশক্তির সহায়ে আমাদের কেহ কেহ পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাবলীর সন তারিখ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনর্গল বলিয়া যাইতে পারেন। অথবা স্যাণ্ডোর শরীর যেমন পেশীতে পেশীতে ফুলিয়া দৃষ্টির শোভা হইয়াছে, সেই-রকম আমাদের মধ্যে দুই-একজন বিদ্বান বা পণ্ডিত আছেন যাঁহারা বিদ্যার সম্ভারে পূর্ণ এক-একটি সচল ভাণ্ডার। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষজ্ঞ গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে, কিন্তু প্রায়ই দেখি বিশেষজ্ঞ যিনি তিনি আপনার বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে—এমন কি সাধারণ জীবনের সাধারণ বিষয়ে পর্য্যন্ত—কেমন অজ্ঞ, অক্ষম, না হয় উদাসীন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ যিনি তিনি সাহিত্যের রসে বঞ্চিত, কেমিষ্ট্ যিনি দর্শনের সহিত তাঁহার ঝগড়া, ভাষাজ্ঞ যিনি বিজ্ঞান তাঁহার মাথায় সহজে প্রবেশের পথ পায় না। একটা উদাহরণ দেই; কথাটা গল্প নয়, একেবারে বাস্তব সত্য। আমাদের জনৈক বন্ধু দর্শনশাস্ত্রে এম-এ দিয়াছেন; তাঁহাকে কি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করা হয়, মহম্মদ আগে না বুদ্ধ আগে; তিনি মাথা চুল্‌কাইয়া অনেক ভাবিয়া গবেষণা করিয়া বলিলেন মহম্মদই আগে হইবেন!

শিক্ষার বনিয়াদ

শেষে বিষম অপদস্থ হইয়া ওজর দেখাইলেন যে তিনি দর্শনের ছাত্র, ইতিহাস ত তাঁহার পাঠ্যতালিকায় নাই! এই দৃষ্টান্তটা অসাধারণ কি না জানি না—একজন প্রফেসর বন্ধু আশ্বাস দিতেছেন যে তা নয়, ব্যাপারটা খুবই সাধারণ; কিন্তু এই-রকম গোছের বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি যে আমাদের শিক্ষায় হইতেছে তাহাতে ভুল নাই। সম্প্রতি কোথাও কোথাও অবশ্য বলা হইতেছে, আর দায়ে পড়িয়া স্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে সকল বিদ্যার সহিত সকল বিদ্যারই কিছু না কিছু সংযোগ আছে, কোন একটি বিষয়ের মধ্যে একান্তভাবে কূপমণ্ডূক হইয়া থাকা চলে না; আমরা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি যে যাঁহার যত বেশী বিষয়ের উপর অধিকার তিনি নিজের বিশেষ বিষয়টির তত মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারেন, তাহাকে তত গভীরভাবে বিশদভাবে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিতে পারেন। আজকাল আমরা বলিতে সুরু করিয়াছি, প্রত্যেক বিদ্যাই খণ্ড-বিদ্যা, জগতের এক-একটা ভাগ কাটিয়া আলাদা করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে মাত্র; সুতরাং মোটের দিক হইতে, আর-সকল বিদ্যার আলোকে যদি অংশবিশেষের বিদ্যাকে দেখি, তবেই তাহা সম্পূর্ণ দেখা হয়, তাহার পুরাপুরি রহস্য উদ্ধার হয়। কিন্তু এই-রকমেও আমরা বিশেষত্বকেই প্রাধান্য দিতেছি, বিশেষ বিদ্যাই মুখ্য কথা, আর-সকল বিদ্যা শুধু সহায় বলিয়া চর্চ্চা করা দরকার, ইহাদের আলোক সেই বিশেষ বিদ্যারই উপর কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য। তা ছাড়া,

আমরা যদি সকল বিদ্যাই নিরপেক্ষভাবে সমান চর্চ্চা করি, তাহা হইলেও সে জিনিষটা হইবে কার্পাস্তিয়ে যে বলিয়াছেন muscle making exercises অর্থাৎ পেশীগড়া ব্যায়াম, তাহারই মত; ইহাতে মন, মস্তিষ্ক বিদ্যা-খচিত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু গোটা মনকে মস্তিষ্ককে—আসল মানুষকে এ-রকমে পাওয়া সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ শিক্ষার এই যে পেশীগড়া পদ্ধতিব কথা আমরা বলিলাম ইহার ভুল এই যে এখানে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে বাহিরের উপর, খণ্ডের উপর—ভিতরকে, সমগ্রকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনা হয় নাই। কি রকমে, আমরা একটু বিশদ করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। শিক্ষার মধ্যে তিনটি স্তর বা ধারা আছে। প্রথম, বিষয় অধিকার; দ্বিতীয়, বৃত্তির চর্চ্চা; আর তৃতীয়, মনের গড়ন ঠিক করা, সামর্থ্য বাড়ান। প্রথম হইতেছে বিশেষ বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া, তৎসম্বন্ধে যত তত্ত্ব ও তথ্য আছে তাহা জানা বা আবিষ্কার করা। দ্বিতীয় হইতেছে মনের বিশেষ বিশেষ বৃত্তিকে মাজিয়া ঘসিয়া তীক্ষ্ণ ও পরিপুষ্ট করিয়া তোলা—যেমন স্মৃতির শক্তি অথবা বিচার-বিতর্কের শক্তি অথবা সাজাইয়া গুছাইয়া ধরিবার শক্তি। আর তৃতীয়টি হইতেছে কোন বিশেষ বিষয়ে বিদ্বান বা শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া নয়, কিম্বা কোন বৃত্তিবিশেষে উৎকর্ষ লাভ নয়, কিন্তু মনের গোড়াটি গোটা মস্তিষ্কটি সতেজ ও শক্তিমান করিয়া তোলা। চলিত শিক্ষা প্রথমটি লইয়াই ব্যাপৃত অর্থাৎ শিক্ষার

যেটি অধমাঙ্গ, যেটি সব-চেয়ে নীচের ও বাহিরের স্তর সেইটিকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলিয়াছে ; দ্বিতীয়টি, যেটি অপেক্ষাকৃত ভিতরের, সেটি যদি এখানে পাই, তবে তাহা নেহাৎ গৌণভাবে ; আর তৃতীয়টি, যেটি সবচেয়ে ভিতরের, সেটির কোন খোঁজ-খবরই আমরা রাখি না। পূর্ণ শিক্ষায় এই তিনটি অঙ্গেরই দরকার, তবে তাহার প্রণালী হওয়া উচিত বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা নয় কিন্তু ভিতর হইতে বাহিরে আসা—চলিত প্রণালীর ঠিক উল্টা ধারায়। ভিতরের খোঁজ না রাখিয়া কেবল বাহির হইতে চাপ দিলে, ভিতরটা হয় মুষ্ড়িয়া যায়, না হয় পায় একটা বিকৃত অস্বাভাবিক রূপ। বিষয় জানাকেই একান্ত করিয়া ধরিলে, বিষয়ের গুরুভারে মনের বৃত্তি সহজভাবে ফুটিয়া উঠিবার পথ ত পায়ই না, বিষয় জানাটাও ঠিক ঠিক হয় না ; কারণ, বৃত্তিকে সেগুলি জোর করিয়া গেলান হয়, হজম করিতে যে সময় যে সামর্থ্য লাগে তাহা সে পায় না। বৃত্তির চর্চ্চাও গোড়ার কথা নয়। স্মরণ-শক্তি বাড়ান দরকার সুতরাং চেষ্টা করিয়া মনে রাখ, বার বার দেখ, মুখস্থ কর ; অথবা বিশ্লেষণশক্তিকে তীক্ষ্ণ করা দরকার, সুতরাং মাথা খাটাইয়া লজিকের থাপে থাপে বুদ্ধিকে চালান অভ্যাস কর—এই ভাবে বৃত্তিকে যথাযথ বিকশিত করিয়া তোলা যায় কি না, বিষয়ের উপর অধিকারও পূর্ণ মাত্রায় হয় কি না, গভীর সন্দেহের কথা। যদি তা'ও হয় তবুও আমরা পাই শুধু বৃত্তিবিশেষে বা বিষয়বিশেষে ওস্তাদী ; এ-রকমে

এক-একজন শ্রুতিধর বা চুল-চেরা তার্কিক অথবা একখানা চলন্ত অভিধান আমরা বানাইতে পারি, কিন্তু সে-সব হয় যেন একটি যন্ত্রবিশেষ—বিশেষ বিশেষ জিনিষ তাহার মধ্যে ফেলিয়া দাও, বাহির হইয়া আসিবে বিশেষ বিশেষ ধরণের তৈয়ারী মাল। কিন্তু এ উপায়ে তেজালো জোরালো মনওয়ালা সহজ স্বাভাবিক মানুষ পাওয়া দুষ্কর। শুধু তাই নয়, বাহির হইতে এরকমে গড়িয়া পিটিয়া লই যে মন, তাহা বেশীর ভাগ হয় গ্রহণের আধার মাত্র, সে মন গ্রহণ করিতে পারে যাহা কেবল গ্রহণ করা যায় যন্ত্রের মত; সৃষ্টিকারী মন, যে মন দান করিতে পারে, যে মন রসজ্ঞ তাহার উদ্ভব এ ভাবে হয় না। সৃষ্টি অর্থ জড় উপকরণ সংগ্রহ বা সাজান নয়, সৃষ্টি হইতেছে প্রকাশ, ভিতর হইতে বাহিরে রূপান্তর, একটা ছন্দে সুরে প্রাণে লীলায়িত আত্মশক্তির বিস্ফুরণ। সেই মন শুধু জানা নয়, কিন্তু আবিষ্কার করিতে পারে ভিতরে যে প্রথমে পাইয়াছে, অনুভব করিয়াছে নিজের সামর্থ্য, জীবন্ত সত্তা। সেই-রকম মনই হইয়া উঠে সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। বিষয়বিশেষে, বৃত্তি-বিশেষের উপর তাহার অধিকার যেমন সহজ সতেজ হয়, তেমনি আবার সেখানে জমিয়া উঠে এমন একটা নৈসর্গিক প্রতিভা, যাহা প্রয়োজন-মত যে-কোন বিষয় যে-কোন বৃত্তি হইয়া অবলীলা-ক্রমে খেলিতে পারে; চিন্তাশক্তির গোড়ায় এমন একটা রস সেখানে সঞ্চিত হয় যাহা যে পথে চলুক না কেন, সেখানেই সজীব সবুজ সৃষ্টির ভাব আনিয়া দিতে পারে। মনের

চিন্তাশক্তির এই গোড়াপত্তন হইলে, আগে যে জিনিষ অতি কষ্টে, জোর করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঘাম ঝরাইয়া আয়ত্ত করিতে হইত, এখন সেটি—তাহা যাহাই হউক না কেন—কেমন স্বভাবসিদ্ধ শক্তিবলে আপনার হইয়া যায়।

শিক্ষার যে তিনটি অঙ্গের কথা বলিলাম সেই হিসাবে ইহাকে একখানা তলোয়ারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তরবারির লক্ষ্য জিনিষ কাটা ; শিক্ষার লক্ষ্যও তেমনি বিষয় অধিকার। কিন্তু আগে দরকার তরবারিকে ধার দেওয়া, শাণ দেওয়া ; সেইরকম শিক্ষাতেও আগে দরকার বৃত্তির চর্চ্চা করা। ভোঁতা তলোয়ার দিয়া কাটিতে আরম্ভ করিলে, কাটিতে কাটিতে কিছু ধার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বেশী কিছু কাটা যায় না, ধার ভাঙ্গিয়া যায়, তলোয়ারখানা একেবারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনাও আছে। সেইজন্য সকলের আগে দরকার তরবারিখানাকে পাকা লোহায় যথাযথ ঢালাই করা ; তাই শিক্ষাতেও দরকার বৃত্তি-চর্চ্চারও আগে মনকে মস্তিষ্ককে একটা শক্ত সমর্থ সুঠাম গড়ন দেওয়া।

শরীরের উন্নতির পক্ষে কসরৎ নয়—আগে দরকার স্বাস্থ্য, একটা সাধারণ সামর্থ্য অর্থাৎ প্রাণশক্তি ও প্রাণশক্তির ছন্দ—কার্পাস্তিয়ে যাহাকে বলিয়াছেন poetry of movement, গতির রসায়ন। এই গোড়ার শক্তিটি কসরৎ দিয়া পাওয়া যায় না, কসরৎ ইহার প্রয়োগ বা প্রয়োগের কৌশল মাত্র ; এটী পাইতে হইলে দরকার অন্য রকম জিনিষ। শিক্ষার বেলাতেও

গোড়ায় চাই এই রকম মনের একটা স্বাস্থ্য, সাধারণ সামর্থ্য, মনেরও একটা প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি। মনের জীবনীশক্তি হইতেছে মননশক্তি বা মনীষা, ধীশক্তি বা মেধা। চলিত শিক্ষাপদ্ধতি এই মনীষাকে মেধাকে জিয়াইবার বাড়াইবার কথাটা একেবারে উহ্য করিয়া রাখিয়াছে; ইহার বিশেষ প্রয়োগের উপর, চিন্তার সহজ সমর্থ ছন্দ নয় কিন্তু চিন্তার কস্‌রতের উপরই সে শিক্ষা সকল শ্রম ব্যয় করিতেছে। চলিত শিক্ষা-পদ্ধতি মেধা ও মনীষার উন্মেষণে যে সাহায্য করিতেছে না, তাহাই নয়, রীতিমত বাধাই দিতেছে। শিক্ষা অর্থ যখন কয়েকখানি নির্দ্দিষ্ট পুস্তক কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট মাসের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা, একটা বাঁধা সময়ের মধ্যে বাঁধা কতকগুলি কথা মগজের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া ও চাহিবামাত্র বাহির করিয়া দেওয়া, তখন সে শিক্ষা চিন্তার সহজ শক্তির উপর যে অনেক-খানিই অত্যাচার উৎপীড়ন, তাহা বলাই বাহুল্য।

মনের বা মস্তিষ্কের প্রয়োগের চাতুর্য্য নয়, কিন্তু তাহার বস্তুর সামর্থ্য, তাহার গড়নের ছন্দ কি করিয়া খেলাইয়া তোলা যায়, ইহাই হইল শিক্ষার গোড়ার সমস্যা। কার্পান্তিয়ে বলিতেছেন শরীরের একটা সহজ স্ফূর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গে একটা লীলায়িত গতি, একটা মুক্ত অথচ সুদৃঢ় বাঁধনী হইতেছে বলচর্চ্চার প্রথম ও মুখ্য কথা। আমরা বলিব, মনকেও মার্জ্জিত শিক্ষিত করিতে হইলে, গোড়ায় মনেরও চাই সেই-রকম একটা প্রসাদগুণ, একটা উদার স্বচ্ছন্দ গতি, ধনুকের ছিলা বা বীণার তারের মত একটা সংহত

শক্তি। এই উদ্দেশ্যে শরীরের জন্য কার্পাস্তিয়ে নির্দ্দেশ করিতেছেন হাঁটিতে শেখা ; মনের জন্য আমরা নির্দ্দেশ করিতে চাই ভাবিতে চিন্তা করিতে শেখা। শরীরের পক্ষে হাঁটা যাহা, মনের পক্ষে ভাবাও তাই। আমাদের দেশের লোক যে ভাল করিয়া হাঁটিতে জানে না তাহার দৃষ্টান্ত পথে ঘাটে চোখে পড়ে, সুতরাং তাহারা ভাবিতে চিন্তা করিতে—গভীরভাবে ভাবা চিন্তা নয়,—সাধারণ ভাবেই ঠিক ঠিক ভাবিতে চিন্তা করিতে অর্থাৎ মনের হাঁটা হাঁটিতে যে জানে না, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের নয়। মানসিক ক্ষেত্রেও আমরা চলি, কখন বাঁকিয়া চুরিয়া, কখন খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া, কখন বা লম্ফ ঝম্ফ দিয়া, কখন বা ঝিমাইয়া হাঁপাইয়া। সহজভাবে আমরা হাঁটিতে জানি না—কত মুদ্রাদোষে মনেরও অঙ্গ-সব বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কখন আমরা মোটেও ভাবি না চিন্তি না, গড্ডলিকা ধারার মত শূন্য অন্ধ মনে চলিতে থাকি, কখনও প্রয়োজনের কশাঘাতে উপস্থিত-মত কিছু একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া লই, কখনও আবেগের উত্তেজনায় যা-তা ভাবি, কখনও পরের চিন্তাভারে ক্লিষ্ট হইয়া মরি। এই-রকম পীড়িত বায়ুগ্রস্ত অসমর্থ মন লইয়াই আমরা আবার কস্‌রতের ওস্তাদীর অভ্যাস করি!

প্রথমে দরকার সুতরাং ভাবিতে শেখা, সহজভাবে চিন্তা করিবার ধরণটি আয়ত্ত করা,—কি বিষয় লইয়া আছি, কোন্ বৃত্তি পরিচালনা করিতেছি, তাহার উপর জোর দিবার কোন দরকার নাই ; যে-কোন বিষয় যে-কোন বৃত্তি হউক না কেন

তাহাকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া গোটা মনকেই খেলাইয়া তুলিতে হইবে। শিশু যখন খেলা করে, তখন কি-জিনিষ লইয়া সে খেলিতেছে তার উপর তাহার খেলা নির্ভর করে না; সব জিনিষই জোগাইতেছে তাহার খেলার আনন্দ। সেইরকম শিক্ষার বেলাতেও ভাবিবার চিন্তিবার আনন্দই হইতেছে মনের খোরাক। তাই মনকে প্রথমে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে, যদৃচ্ছভাবে চলিতে দিতে হইবে; তবেই মন পাইতে থাকিবে চিন্তার রসায়ন, একটা গতির ছন্দ ও সামর্থ্য। শিশু স্বভাবতঃই কৌতূহলী অর্থাৎ অনুসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসু; তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, চালাইয়া লইতে হইবে এই জিজ্ঞাসার পথে। শুধু ভিতর হইতে যে জিজ্ঞাসা আপনা হইতে আসে, তাহাতেই কিন্তু আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, শিশুর মনে ক্রমে নূতন নূতন জিজ্ঞাসাও তুলিয়া দিতে হইবে। অজানা অপরিচিত জিনিষ তাহার চোখের মনের সম্মুখে ধরিয়া দিতে হইবে, সে-সবকে সুন্দর মনোহরী করিয়া রসে ভরিয়া শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে যত জল্পনা কল্পনা করিতে পারে তাহাতে উৎসাহিত করিতে হইবে। শিশুর বা শিক্ষার্থীর মনের প্রসার ও গভীরতা কম, তাই শিক্ষককে নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে, নূতন নূতন অনুভূতির উত্তেজক (stimulus) জোগাইতে হইবে,—কিন্তু কোন রকম জোর না দিয়া, খেলার সাথে, গল্পচ্ছলে, অবান্তরভাবে। টোপ ফেলিয়া, চার ছড়াইয়া বসিয়া দেখিতে হইবে মাছ ধরে কি না—ধরিলে

ভালই, আস্তে আস্তে খেলাইয়া তবে ছিপের সম্পূর্ণ আয়ত্তে তাহাকে আনিতে হইবে; না ধরিলেও কোন রকম তাড়াহুড়া করা বা অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নয়। বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া শিক্ষার্থীর মনের দুয়ারে জিনিষ আগাইয়া দিতে হইবে, দেখিতে হইবে কোনরূপ রস সে উহাতে পায় কি না, কোন সুপ্ত তন্ত্রী তাহার মধ্যে বাজিয়া উঠে কি না—শিক্ষার্থীর যদি কোন বিশেষ প্রতিভা থাকে তবে তাহা এই ভাবেই ধরা পড়িবে, ফুটিয়া উঠিবে। তারপর, শিশুর মনে শৃঙ্খলা নাই; বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সে কিছু দৃক্‌পাত না করিয়া হঠাৎ চলিয়া যায়; একটা বিষয়কে ধরিয়া তাহার শেষ সিদ্ধান্ত logical conclusion পর্য্যন্ত ধাপের পর ধাপ বাহিয়া চলা হইতেছে পরিণত বুদ্ধির ধর্ম্ম, তরুণ শিক্ষার্থীর কাছে তাহা আশা করা অন্যায়। এই সে পাখীর রংচংএর কথা আলোচনা করিতেছে, এই আবার কবিতা আওড়াইতে আরম্ভ করিল, সেটা অসমাপ্ত রাখিয়াই আবার হয়ত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, মরিলে পর মানুষ কি হয়। শিক্ষককে অসীম ধৈর্য্য সহকারে শিক্ষার্থীর মনের এই খেয়ালের পথে চলিতে হইবে, একটু একটু করিয়া অর্দ্ধসমাপ্ত-ভাবে নানা-রকম রস জোগাইতে হইবে। এই-রকমেই মনের মধ্যে সহজ সাড়া পড়ে, সজীব শক্তি সঞ্চিত হয়, একটা গতিবেগ ছন্দে সামঞ্জস্যে লীলায়িত হইয়া উঠে, চিন্তায় জড়তা জন্মিতে পারে না, বুদ্ধিতে মরিচা ধরিতে পারে না।

শিক্ষায় শিক্ষার্থীর এই স্বাধীন স্বেচ্ছাতন্ত্র গোড়ার জিনিষ।

অবশ্য, এইটুকুই যদি সব হইত তবে শিক্ষার সমস্যা অনেকখানিই সহজ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই; দুঃখের বিষয় তাহা নয়। শিক্ষার মধ্যে একটা নিয়ম-সংযমের (discipline) বিশেষ স্থান আছে, সেইটিই যত গোলমাল আনিয়া দেয়। শিশুকে পুস্তকের সহিত পরিচয় করাইতে হয়—তাহাকে ঠিক ঠিক লেখা ও পড়া শিখিতে হয়। এ জিনিষটি এখন যেমন ভাবে করা হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক সরস করিয়া তোলা যাইতে পারে বটে, তবুও একটা জায়গায় গিয়া একটু জোর জবরদস্তি আসিয়া পড়েই। কারণ, মুখে মুখে খেলাচ্ছলে যাহা যে-ভাবে শিখান যায় বা যাইতে পারে, তাহা শিশুর স্বাভাবিক জীবনের সুরে তালে মিলিয়া মিশিয়া চলে। কিন্তু অক্ষর পরিচয় ও পুস্তক পাঠ অথবা লিখন ও অঙ্কন যে মুহূর্ত্তে আরম্ভ হয়, সেই মুহূর্ত্তে শিশুর মনের উপর চাপ পড়ে আর-একটা ভিন্ন রকমের জগতে উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য। এই ধাপটা যতই মোলায়েম, এই বাঁকটা যতই সোজা করিয়া ধরা হউক না, একটা ঝাঁকি শিশু অনুভব করিবেই। শুধু শিশুর পক্ষে কেন, শিক্ষার্থীর পক্ষে বরাবরই—শিক্ষা অর্থ উন্নতি বা ক্রমারোহণ বলিয়া—জিনিষটা যতই সুন্দর মনোরম চিত্তাকর্ষকভাবে আসুক না, মনের মধ্যে একটা জায়গায় একটু টানাটানি একটু কশাকশি হইবেই। শিক্ষার্থীর মনের রাশ যদি একদম ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সেখানে জন্মে একটা উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব; মন তেজালো হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই সাথে থাকিয়া যায় একটা চপলতা,

একটা অপক্কতা, নিজের উপর দখলের অভাব। আমাদের দোষ, এই নিয়ম-সংযম বাঁধন-ছাঁদন আটঘাটকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলি; কিন্তু এ জিনিষটা আগের কথা নয়; আগের কথা—কি নিয়মিত সংযত করিব, কাহাকে বাঁধিব ছাঁদিব সেই বস্তুটির জন্ম দেওয়া। তা ছাড়া, বাহির হইতে নিয়ম যতদূর আরোপ না করা যায় ততই ভাল, শিক্ষার্থী যাহাতে নিজেকে নিজে নিয়মিত (self-discipline) করিবার প্রেরণা ও কৌশল পায় তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু এসব সার্থক হইবে তখনই যখন গোড়ায় পাই তেজালো মন, সজীব মস্তিষ্ক, সৃষ্টিকারিণী চিন্তাশক্তি।

এই জিনিষ কোন-রকম বিদ্যালয়ের মধ্যে—school systemএ—তৈয়ারী হয় কি না, ইহাও একটি দরকারী প্রশ্ন। আমরা মনে করি, তা হয় না, অন্ততঃ হওয়া খুবই কঠিন। স্কুল অর্থই হইতেছে শিক্ষার্থীকে তাহার প্রতিনিমিষের পারিপার্শ্বিক হইতে তুলিয়া লইয়া শিক্ষাঘরের মধ্যে আট্‌কান, তাহার জীবনের ও শিক্ষার মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করা। স্কুলকে অবশ্য খুব খোলা, খুব মুক্ত, উদার রকমের করা যাইতে পারে—ঘরের মধ্যে পঠন পাঠন না করিয়া গাছের তলায়, নদীর ধারে বা মাঠের কোলে তাহা করিতে পারি, কিম্বা বিদ্যালয়টিকে ছেলেদের বসতবাটীর মত (residential) করিয়া দিতে পারি, কিন্তু এসব ছেলেদের সহজ জীবন নয়, জীবনের অভিনয় মাত্র। এ-সমস্ত স্কুলের খোলসের পরিবর্ত্তন মাত্র, ইহাতে স্কুলের স্কুলত্ব

বিশেষ কিছু নষ্ট হয় না। যে-সব জিনিষ জীবনের সহজ প্রকাশ, জীবনের অন্যান্য সহস্র জিনিষের সহিত সংযুক্ত সম্মিলিত, সে-গুলিকে যথাস্থান হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাজাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলে অনেক সময়েই আসল সজীব জিনিষ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় একটা নকল ছবি। তাই আমাদের মনে হয়, আধুনিকতম নব শিক্ষা-পদ্ধতিতে (যেমন মন্তেসরি কি রবীন্দ্রনাথের) পরিচালিত বিদ্যায়তনগুলিও জীবনের অকৃত্রিম বনভূমি নয়, তাহার অনু-করণে এক-একটি সাজান বাগান মাত্র। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে কোন বিদ্যাপীঠ ছিল না, ছিল গুরুগৃহ। শিক্ষার্থী গুরুর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতেন; সেইখানে থাকিয়া, সেখানকার কাজকর্ম্মে মিলিয়া মিশিয়া, গুরুর ধেনু-সকলের পরিচর্য্যা করিতে করিতেই শিক্ষার্থী শিক্ষা পাইত। আমাদের মনে হয়, শিশু যেখানে জন্মিতেছে বাড়িতেছে, শত সম্বন্ধে আপনাকে ছড়াইয়া বাঁধিয়া তুলিতেছে, সেই পরিবারটিকেই যদি বিদ্যাপীঠ করিয়া তুলিতে পারি, তবেই তাহা হইবে জীবন্ত বিদ্যাপীঠ। এজন্য অবশ্য পরিবারের অনেকখানি সংশোধন পুনর্গঠন হওয়া দরকার। সমাজসংস্কারকেরা চরিত্রনীতির দিক হইতে, অর্থনীতির দিক হইতে, এমন কি রাজনীতির দিক হইতেও পারিবারিক সমস্যাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন; পরিবারকে যে শিক্ষানীতির দিক হইতেও দেখা যাইতে পারে, পরিবার যে বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃষ্ট আয়তন হইতে পারে, এ কথাটির

উপর বিশেষ জোর দেওয়া আবশ্যক মনে করি। সে যাহা হউক, শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিবারের কি-রকম সংস্কার হওয়া প্রয়োজন, সে প্রশ্নের মীমাংসা আমরা এখন করিতে বসি নাই ; আমাদের কথা এই যে, পরিবারই যখন হইবে সজীব বিদ্যালয়, শিক্ষার্থীর শিক্ষা যখন চলিতে থাকিবে তাহার সামাজিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া অর্থাৎ শিক্ষা যখন হইবে জীবন্ত জীবনের জীবন্ত প্রকাশ, তখনই হইবে আদর্শ শিক্ষা।

এসব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে জীবন হইতে বিদ্যাশিক্ষাকে যখন আমরা পৃথক করিয়া লই তখনই, শিক্ষা হইয়া উঠে একটা কষ্টসাধ্য কস্‌রৎ, মন তাহার সজীবতা হারাইয়া হইয়া পড়ে একটা কৃত্রিম যন্ত্র। মন তাজা থাকে, মনের শক্তি বাড়িয়া উঠে জীবনের রসে ; জীবন নীচে হইতে মনকে ধরিয়া রাখিবে, মনও আপনার আলো জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে থাকিবে, এইরকম অবাধ আদানপ্রদানে উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে—পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম-বাপ্‌স্যথ। আমাদের শিক্ষার এই দুইটি স্তরের সংযোগসূত্রটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে (lesion), তাই মনে আসিয়াছে কৃত্রিমতা আর জীবনে অসুস্থতা। মনে যে শুধু সজীবতা সামর্থ্য হয়, তাহা নয়, মনের গড়ন, ভাবিবার চিন্তিবার ধরণটিও ঠিকঠিক হয় যখন গোড়ায় সে মন—সে ভাবা ও চিন্তা—পরিপুষ্ট সুসংহত হইতে থাকে জীবনেরই অভিজ্ঞতাকে অনুভূতিকে জিজ্ঞাসাকে আশ্রয় করিয়া।

শিক্ষা ও দীক্ষা

শিক্ষার বনিয়াদ হইতেছে, আমরা আবার বলি, মনের দুইটি শক্তি—মেধা অর্থাৎ মনের ধারণাশক্তি, আর মনীষা অর্থাৎ মনের গড়ন। সেই মনই মেধাবী যাহার উপর যতখানি চাপ দেও না কেন তাহা অবলীলাক্রমে ধরিয়া রাখিতে পারে, যাহা প্রশস্ত বহুমুখী ও নিবিড় হইয়া যথেচ্ছভাবে আপনাকে ঢালিয়া দিতে পারে; সেই মনই মনীষী যাহা পাইয়াছে সুবলয়িত সুসীম গতি, সত্যের একটা সজীব অব্যর্থ শৃঙ্খলা। এই দুইটি জিনিষ স্বভাবজ বা প্রকৃতিদত্ত বলিয়া ছাড়িয়া দিলে, শিক্ষার মূল সমস্যাটিকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ভিত্তি যে রকমটিই পাওয়া যাক্ না কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কেবল উপরের গড়াপেটায় সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করিলে, সে শিক্ষা হয় মাথা-ভারী পঙ্গু বা দৃষ্টি-শোভাকর। একটা পরিচিত পুরাতন উপমা দিয়াই আমরা বলিব—বৃক্ষকে যদি পাতায় শাখায় ফুলে ফলে সমৃদ্ধ দেখিতে চাও, তবে কেবল সেগুলির উপর লোলুপ হইয়া থাকিলে চলিবে না, দরকার গোড়াটি খুঁজিয়া বাহির করা, তাহাকে পরিষ্কার করা, সেখানে জল ঢালা সার দেওয়া।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি

আধুনিক যুগের যন্ত্রপাতি কল-কারখানা আমাদের অনেক উপকার ঢের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেই সাথে মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিষ নষ্ট করিয়া দিতেছে যাহার অভাব আর-কিছু দিয়াই পূরণ হইতে পারে না। কাজকর্ম্ম করিতে হইলেই মানুষ লইতেছে যন্ত্রের সহায়, অর্থাৎ মানুষ ব্যবহার করিতেছে না নিজের হাত পা চোখ কান অথবা ব্যবহার করিতেছে ততটুকু যতটুকু দরকার যন্ত্রটাকে চালাইবার জন্য। ফলে, মানুষের অঙ্গের ইন্দ্রিয়ের আছে যে-সব স্বাভাবিক ক্ষমতা তাহা ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে না, অনভ্যাসের অথবা বিপরীত অভ্যাসের দরুণ সে-সব শুকাইয়া মরিয়া যাইতেছে। সিষ্টার নিবেদিতা এক জায়গায় বলিয়াছেন যে ইউরোপীয়েরা খাওয়ার সময় যে কাঁটা চামচ ব্যবহার করে সেজন্য তাহাদের আঙ্গুলে দেখা যায় কেমন একটা কাঠ কাঠ আড়ষ্ট ভাব, একটা স্ফুর্ত্তির—expressionএর—অভাব ; আর ভারতবর্ষের লোকেরা যে হাত লাগাইয়া খায় সেজন্য তাহাদের আঙ্গুলগুলিকে বোধ হয় কেমন সজীব, সেখানে পর্ব্বে পর্ব্বে ধরা দিয়াছে খেলিয়া উঠিয়াছে যেন একটা ভাবের সজীব প্রকাশ। কথাটি যতই কবিত্বময় হউক না, ইহার মধ্যে যে কোনই সত্য নাই তাহা একেবারে বলা চলে না। আজকাল

শিক্ষা ও দীক্ষা

স্কুলের ছেলেদের দেখি প্রত্যেকের চাই এক-একটা 'ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট বক্স'—একটি সোজা লাইন আঁকিতে গেলে তাহাদের দরকার হয় 'রুল', 'সেট্‌ স্কোয়্যার'; শুধু-হাতে কি-রকমে যে নির্দ্দোষ সরল রেখা টানা যায়, পরিষ্কার বৃত্ত আঁকা যায়, তাহা আমাদের ছেলেরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। কুমারেরা পুতুল গড়ে, স্বর্ণকারেরা গহনা তৈয়ার করে, তাঁতীরা সুতা কাটে কাপড় বোনে, কেমন সহজে আঙ্গুল খেলাইয়া চোখের নিরীখ দিয়া; সে জায়গায় আধুনিক শিল্পীর দরকার কত থার্মোমিটার, ব্যারো-মিটার, মাপ-জোখ করিবার জন্য আরও কত কি যন্ত্রপাতি। কিন্তু এই আজকালও কাঠের উপর চীনা মিস্ত্রীর হাতের কাজ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই, তার পাশে কলের কাজ আমাদের চোখে ধরে না। কত দিক দিয়া যে যন্ত্রপাতি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পর পুস্তকাদি তৈয়ার করিবার প্রচার করিবার বিপুল সুবিধা আমাদের হইয়াছে। আগে একখানি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে কত সময় ও কত প্রয়াস দরকার হইত, আর এখন ব্যাপারটি কত সহজ কত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে; আগে যেখানে একখানি গ্রন্থ অতিকষ্টে পাওয়া যাইত, এখন সেখানে সহস্রখানি—আবার তাহাও কত রকম চেহারার—হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায়। ছাপার হরফ উপকার করিয়াছে আমাদের ঢের, কিন্তু তাহা একটা জিনিষকে তাড়াইয়া দিয়াছে—যাহাতে বাহিরের স্থূল উপকার থাকুক বা না থাকুক,

ছিল মানুষের অন্তরের রসায়ন। সুন্দর হস্তলিপি (calligraphy) বলিয়া যে একটি বিদ্যা বা কলা ছিল, আধুনিকযুগে কলের লেখার দৌরাত্ম্যে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। আগে এক-একখানি গ্রন্থ গ্রন্থমাত্র ছিল না, তাহা ছিল এক-একখানি চিত্রসংগ্রহ বা ছবির 'এ্যাল্‌বাম্‌'। আজ কিন্তু পদে পদে আমাদিগকে যন্ত্রের সহায়ে, যন্ত্রের কৃপায় চলিতে হইতেছে; যন্ত্র যদি পরীক্ষা করিয়া মাপিয়া ঠিকঠাক করিয়া না দিল, তবে আর আমাদের চলা হইল না। যন্ত্র-বিহনে আমরা অসহায় জড়পিণ্ড—দারুভূতো মুরারি।

কল-কারখানার প্রাদুর্ভাবে সমাজে যে অসামঞ্জস্য যে নূতন নূতন ধরণের অন্যায় অত্যাচার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, মানুষের স্বাস্থ্য কিরূপে নষ্ট হইতেছে, নৈতিক অবনতি কিরূপে ঘটিতেছে—সে-সব কথা বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমরা বিষয়টি দেখিতে চাই আরও একটু ভিতরের দিক হইতে, আমরা বলিব আরও গভীরতর একটা অনিষ্টের কথা। মানুষের প্রকৃতিটাই যে বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির প্রবৃত্তির—অন্তঃকরণের, বহিঃকরণের—উল্লাস যে স্তিমিত হইয়া যাইতেছে, তাহাদের ধার যে মরিয়া যাইতেছে, জমাট আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে প্রাণের সলীল সচ্ছল স্বচ্ছন্দ গতির পরিবর্ত্তে যে দেখা দিয়াছে জড়ের ধরিয়া বাঁধিয়া চলা—ইহাই ত মূল সমস্যা। ইন্দ্রিয়ের আছে একটা সহজ শক্তি তীক্ষ্ণ অনুভূতি অটুট সন্ধান, সে কথাটা আজ আর আমাদের বিশ্বাসের মধ্যেই

প্রায় আসে না। সজাগ ইন্দ্রিয় যে কতখানি অব্যর্থভাবে চলে, জিনিষের উপর অবলীলাক্রমে কতখানি দখল আনিয়া দেয়, তাহা আমরা আর কল্পনাও করিতে পারি না। বৈদিক ঋষিরা তাই ইন্দ্রিয়দিগকে বলিতেন দেবতা; কিন্তু 'আলোকের যুগে' আমরা আর দেবতার ভোগ দেই না, দেবতাকে মানিই না। দেবতা আজ নাই, আছে শুধু শালগ্রাম—কর্ম্মের, ব্যবহারের অভাবে হাত পা সব পেটের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছে অথবা বিকর্ম্মের, অপব্যবহারের ফলে ভোঁতা হইয়া ঠুঁটো হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু কলে জিনিষ যে তাড়াতাড়ি হয়, মোট পরিশ্রমের লাঘব হয়; আমরা সময়ের মূল্য যে বড় বেশী বুঝিয়াছি আর আমাদের প্রয়োজনও যে হয় বিস্তর দ্রব্যসম্ভার—কাজেই কল ছাড়া উপায় নাই। উপায় থাকুক বা না-ই থাকুক, ইহা স্পষ্ট দেখিতেছি যে তাড়া-হুড়া করিয়া জিনিষের উপর জিনিষ আমরা স্তূপ করিতেছি বটে, কিন্তু সুন্দর জিনিষ খুব কমই পাইতেছি। সৌন্দর্য্য জিনিষটি যে প্রাণের রং; প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, ইন্দ্রিয়ের প্রেমস্পর্শ বুলাইয়া দিয়া যে-জিনিষ গড়ি নাই তাহাতে সৌন্দর্য্য পাইব কিরূপে? তবুও সুন্দর জিনিষ পাই বা না পাই, তাহাও না-হয় না দেখিলাম; কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষতি হইতেছে মানুষের নিজেরই—তাহার ইন্দ্রিয় তাহার প্রাণ নির্জীব অক্ষম অসহায় হইয়া পড়িতেছে। আস্তে আস্তে যন্ত্রের উপর আমরা এতখানি নির্ভর করিয়া ফেলিয়াছি যে নিজের

যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি

অঙ্গের নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর সহজে আমাদের ভরসা হয় না; সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয় পাছে ভুল করিয়া ফেলি, প্রতি নিমেষে কলকাঠি হাত্‌ড়াইয়া বেড়াই, তাহাকে ধরিয়া ধরিয়া তাহার সাথে মিলাইয়া মিলাইয়া চলিতে চাই। কিন্তু এ প্রশ্নটা মনে উঠে না, এই কলকাঠি যন্ত্রপাতি কাহার বিভূতি কাহার ঐশ্বর্য্য, কে উহাদিগকে গোড়ায় সৃষ্টি করিল? ইন্দ্রিয় অন্ধ নয়, জড় নয়—সে কেবল ভুল করিয়া বেড়ায় না। ইন্দ্রিয় আত্মস্থ পুরুষেরই মত—সে জানে কোথায় কোন্ ভাবে কি করিতে হইবে। সাহসে ভর করিয়া যদি ইন্দ্রিয়কে মুক্ত করিয়া দিতে পারি তাহার সহজ পথে অবাধে চলিতে, তবে অবিলম্বেই প্রমাণ পাইব ইন্দ্রিয়ের আছে কি অদ্ভুত প্রতিভা। সেই মানুষই বাস্তবিক ততখানি প্রতিভাবান্ যিনি যতখানি যন্ত্রপাতির অত্যাচারের হাত এড়াইতে পারিয়াছেন, আপন ইন্দ্রিয়কেই সজাগ শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছেন। তাজমহল কি যন্ত্রপাতি দিয়া তৈয়ার হইয়াছিল, একটি বৌদ্ধবিহারে কতগুলি 'ক্রেন্' কতগুলি ইঞ্জিন আর কতগুলি কি লাগিয়াছিল তাহা কেহ জানে না, তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ হল্' তৈয়ারী করিতে আজকালকার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা যত বিপুল যত রকমারি সাজসরঞ্জাম লাগাইতেছে তাহার শতাংশের একাংশও সেখানে লাগে নাই।

যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া, যন্ত্র ব্যবহার করিতে জানে বলিয়া মানুষ, মানুষ—সত্য কথা; কিন্তু যন্ত্র ততক্ষণই মঙ্গলকর

যতক্ষণ সে যন্ত্রমাত্র। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যন্ত্রটা সব সময় আর যন্ত্র থাকে না, সে হইয়া উঠে যন্ত্রী ; মানুষ যন্ত্রের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়া হইয়া পড়ে যন্ত্রেরই অঙ্গ। এ অবস্থায় মানুষের সে সজাগ কর্ত্তৃত্ব, সচেতন শক্তিপ্রয়োগ আর থাকে না ; মানুষ অনুভব করে না যে সে-ই জিনিষকে সৃষ্টি করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সে কাজ করে বটে, কিন্তু বোধ হয় যেন তাহাকে দিয়া কাজ করান হইতেছে মাত্র—সে চলিতেছে না, চালিত হইতেছে। সে কর্ত্তা নহে, করণ মাত্র। সে হারাইয়া বসে নিজত্ববোধ, স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মবোধ। মানুষ আর যন্ত্রকে চালায় না, যন্ত্রই চালায় মানুষকে। আধুনিক যুগেও আমাদের জগদীশচন্দ্র জড়বিজ্ঞানেরই ক্ষেত্রে এমন সফল হইয়াছেন, তার কারণ তাঁহার মধ্যে আছে যন্ত্রের নয়, একটা যন্ত্রীর ভাব—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হইয়াছেন এইজন্য যে তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্ব সব এমন সহজ সাদাসিধা যন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগদীশচন্দ্রের মধ্যে আছে একটা সজাগ নিরালম্ব ইন্দ্রিয়ানুভূতি, উহাই তাঁহার যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করিয়াছে, সেগুলির মধ্যেও এমন সরলতা—সরসতা পর্য্যন্ত আনিয়া দিয়াছে।

যন্ত্রপাতির কথা বলিতে গেলে, প্রথমেই মনে হয় জড়-বিজ্ঞানের কথা। ফলতঃ যন্ত্রপাতি জিনিষটা এক-রকম জড়-বিজ্ঞানের সৃষ্টি। জড়বিজ্ঞানের উন্নতি-সমৃদ্ধির সাথে সাথে তাহারও উন্নতি সমৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। যন্ত্রপাতির অভাবটা দেখাইতে হইলে, জড়বিজ্ঞানেরই অভাবটা দেখাইতে হয়।

জড়বিজ্ঞানই দিতেছে মনের এমন একটা গড়ন চলন, যাহার ফলে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির স্বাভাবিক সজীবতা আর থাকিতে পারে না, মানুষের সহজ সবুজ বোধশক্তিটি ক্রমে মরিয়া যায়। জড়বিজ্ঞান মানুষকে কি ভাবে জগৎটি দেখিতে বলে—মানুষের কোন্ অঙ্গের উপর বেশী জোর দেয়, কোন্ বৃত্তিটি সহায় করিয়া চলে? জড়বিজ্ঞানের আশ্রয় হইতেছে তর্কবৃত্তি, মানুষের সংশয়াত্মক বুদ্ধি। জড়বিজ্ঞান হঠাৎ সোজাসুজি কোন মীমাংসায় পৌছিতে চায় না—সে প্রথমে ধরে কতকগুলি বাস্তব বস্তু (facts) অর্থাৎ এমন কতকগুলি জিনিষ যাহার সত্যতা সম্বন্ধে সকল মানুষেরই স্থূল ইন্দ্রিয় সাক্ষ্য দিতে পারে; তারপর এইগুলি তুলনা করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া বিচার করিয়া ক্রমে কার্য্য হইতে কারণে, সঙ্কীর্ণতর স্থূলতর সত্য হইতে বৃহত্তর নিগূঢ়তর সত্যে পৌছিতে চেষ্টা করে। এই নূতন সত্যকেও সে ব্যবহার করে, পরখ করিয়া লয় দুই রকমে—প্রথমে, ইহা হইতে নূতন বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব অর্থাৎ যাহা সহজ সাধারণভাবে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ে সর্ব্বদা ধরিতে পারে না এমন জিনিষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে; দ্বিতীয়তঃ, দেখিয়া লয় এই নূতন সত্য যাহাতে সহজ বাস্তব বস্তুর একান্ত বিপক্ষে না দাঁড়ায়, বরং তাহাদের একটা সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেয়, তাহাদিগকে পদে পদে প্রমাণিত করিয়া চলে। এই প্রণালীর নামই ত Scientific অথবা Experimental Method—'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'। এখন, এই প্রণালী অর্থাৎ শুধুই এই প্রণালী অনুসরণ করিলে দুইটি দোষ থাকিয়া

যায়। প্রথমতঃ, দৃষ্টি আমাদের সব সময়ে আবদ্ধ হইয়া পড়ে বাহিরের দিকে, আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় জোর দিয়া ফেলি জিনিষের স্থূলভাগের, খোলসের উপর। জিনিষের যেটা সবচেয়ে ভাসা-ভাসা স্তর, যেটা নিরেট স্থির স্থাণু (static) সেইটাকেই কসিয়া ধরি—ইন্দ্রিয়েরও যে আছে একটা তদনুরূপ ছাঁচ তাহার সহায়ে। অন্য কথায়, তর্কবৃত্তি দেয় জিনিষের কাঠিন্যের নিয়ম (Laws of Solids), অথবা আরও একটু সাধারণভাবে বলিতে গেলে, জিনিষের স্থূল বিস্তারের নিয়ম—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সার বা চুম্বক হইতেছে জ্যামিতিক পদ্ধতি। কিন্তু বস্তুর কি কেবল আছে কাঠিন্যগুণ, না তাহা কেবল স্থূল আকাশেই বিস্তৃত ? তাহার কি অন্য ধর্ম্ম নাই, অথবা এমন বস্তু নাই কি যাহার আরও অন্য রকমের ধর্ম্ম আছে ? তাহা যদি থাকে, তবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়া তাহাদের পরিচয় পাওয়া যাইবে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বিতীয় দোষ এই যে, তুলনা শ্রেণীবিভাগ ছাড়া সে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। প্রত্যেক জিনিষকে দেখিবার বুঝিবার জন্য প্রথমে সে তাহাকে আলাদা করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া লয় ও পরে সেই রকমেই আলাদা-করা কাটা ছাঁটা অন্যান্য জিনিষের সহিত তুলনা করিতে বসে ; এই তুলনার সময়েও আবার প্রত্যেক জিনিষকে সে দেখে বিশ্লেষণ করিয়া, অঙ্গ হইতে অঙ্গ ভিন্ন করিয়া, পেঁয়াজের মত একটির পর একটি দল খুলিয়া খুলিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া। প্রত্যেক জিনিষ যেমনটি আছে তেমনি

অবস্থায় গোটাভাবে রাখিয়া শুধু তাহারই উপর ধ্যান দিয়া, তাহার নিজের সত্তা দিয়া নিজের পরিচয় সে লইতে পারে না *। তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চরম সিদ্ধান্ত হইতেছে The Law of Relativity; বৈজ্ঞানিকের কাছে জগৎটা আর কিছুই নয়, হইতেছে কেবল a system of relations, সম্বন্ধের সমষ্টি। সৃষ্টিতে নিত্য সত্য (absolute truth) বলিয়া কিছু নাই, সব সত্যই আপেক্ষিক; একটি সত্য আর-একটি সত্যকে অপেক্ষা করিয়া আছে অর্থাৎ একটি বিশেষ সত্য সত্য বলিয়া দাঁড়ায় তখনই যখন আর-একটি বিশেষ সত্য সত্য বলিয়া দাঁড়ায়। এই শেষোক্ত সত্যটিও আবার আর-একটি সত্যের গা ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।—এই রকমে সৃষ্টি যেন একটা বদ্ধমুখ শৃঙ্খলের আকার পাইয়াছে। পৃথিবী স্থির, মানুষের গতির সম্পর্কে; আবার সচল, সূর্য্যের স্থিতির সম্পর্কে; সূর্য্য আবার সচল, স্থির সৌর জগতের সম্পর্কে; সৌর জগৎ সচল, সমস্ত আকাশের স্থিতির সম্পর্কে।—এই রকমে সত্যের নিত্য বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। সত্য যাহাকে বল তাহার নিত্য সত্তাও (substance) নাই, বস্তু বা জিনিষ যাহার নাম দেই তাহা গুণ-সমষ্টি মাত্র—সে গুণও আবার দেখার ভঙ্গী মাত্র। শক্ত নরম, ঠাণ্ডা গরম, ছোট বড়—সবই তুলনা-মূলক, একই জিনিষকে বিভিন্ন জিনিষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া দেখিবার ফল।

* পতঞ্জলি যোগসূত্রে যে প্রক্রিয়ার নাম দিয়াছেন 'সংযম'।

বিজ্ঞানের কথা বলিতে বলিতে আমরা দর্শনের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব ত দর্শনেরই অন্তর্গত। দর্শনেও তর্কবুদ্ধি তাহার আসন করিয়া লইয়াছে—বরং বলিব দর্শন বলিতেই আমরা বুঝি তর্কবুদ্ধির খেলা। বিজ্ঞান ও দর্শন হাত-ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। একখানে যাহাকে বলি Scientific বা Experimental Method, আর একখানে তাহাই হইয়াছে Critical বা Rational Method; ক্রিটিক্যাল্ বা র্যাশান্যাল্ পদ্ধতি কাহাকে বলি? উহার ভিত হইতেছে সন্দেহ; সত্যকে পাইতে হইলে, চলিতেও হইবে এই সন্দেহের উপর ভর করিয়া (Descartes). মন সহজেই সরাসরি যাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে চায়, দার্শনিক বুদ্ধি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেখানে ইতস্ততঃ করে—জিজ্ঞাসা করে, ঠিক কি, সত্য কি? সব সন্দেহের চক্ষে দেখিতে হইবে। মন সংস্কারের দাস, ইন্দ্রিয় ভুল দেখে—সুতরাং আরম্ভ করিতে হইবে কিছু না দিয়া, গোড়ায় অন্তঃকরণকে করিয়া ফেলিতে হইবে একখানা পরিষ্কার শ্লেটের মত *tabula rasa* (Locke). মনটাকে শূন্য করিলাম না হয়; তারপর চলিব কি রকমে? বিচারের দ্বারা। বিচার কাহাকে বলে? ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি প্রথমে ত স্বীকার করিতেই হইবে—স্বীকার কর কিন্তু আপাততঃ, পরীক্ষার জন্য; স্বীকার করিয়া দেখ কি হয়, কি রকম স্বীকার করিলে সবদিকে সঙ্গতি থাকে, অন্তর্দ্বন্দ্ব (self-contradiction) না ফুটিয়া উঠে। বিচার চলে তিনটি ধাপে—স্বীকার, অস্বীকার আর

সমন্বয় অথবা পক্ষ প্রতিপক্ষ আর সিদ্ধান্ত (কাণ্টের Affirmation, Negation, Limitation এবং হেগেলের Thesis, Antithesis, Synthesis)—এই তিনটি ধাপের ক্রমপরম্পরা লইয়াই Critical বা Rational Method. এখন, দর্শনে এই প্রণালী অনুসরণ করিবার ফল হয় এই যে, বাস্তবের সহিত মানুষের সহজ অদ্বৈধ সংযোগ (sense of reality)—স্পষ্ট কথায়, কাণ্ডজ্ঞানটি—লোপ পায়। তর্কবুদ্ধি উর্ণনাভের মত নিজের ভিতর হইতে সিদ্ধান্ত সব বাহির করিয়া করিয়া খাড়া করে একটা কাল্পনিক জগৎ, একটা system of theories ;—সৃষ্টির মূলতত্ত্ব ধরিতে গিয়া তত্ত্বের মধ্যে গিয়া সে বাঁধা পড়ে, কিন্তু মূল সৃষ্টিটি অবজ্ঞাত হইয়া একপাশে পড়িয়া থাকে।

কেবল তর্কবুদ্ধি দিয়া চলিলে বিজ্ঞানের মত দর্শনেও নিত্য সত্য কিছু পাই না। সত্য অর্থে বুঝি যে একটা ধ্রুব অটুট শাশ্বত কিছু, তাহার মানদণ্ডই যেন যায় হারাইয়া। বিজ্ঞানে জগৎকে পাই যেমন System of Relations রূপে, সেই রকম দর্শনেও সত্যকে পাই System of Consistencies রূপে ; সত্য হইতেছে তাহা ততক্ষণ যাহাতে যতক্ষণ আছে সঙ্গতি ;—স্বগত বিগত অসঙ্গতি যাহাতে নাই তাহাই চরম সত্য। কারণ, তর্কবুদ্ধিতে সৎ বলিয়া কিছু পাই না, তর্কবুদ্ধিতে সবই প্রাতিভাসিক (phenomenal), জগৎটি অনুভূতিসংগ্রহ মাত্র, বস্তু বা সত্তা (Reality, Noumena) সে বৃত্তির কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown and unknowable). বৌদ্ধ দর্শন

তর্কবুদ্ধির চরম পরিণতি ; আত্মা ঈশ্বর, সৃষ্টির মধ্যে একটা নিত্য সত্তা সম্বন্ধে বৌদ্ধদর্শন নির্ব্বাক্, শুধু নির্ব্বাক্ নয়, অবিশ্বাসী—সে দেখিতেছে কেবল 'কর্ম্ম-চক্র', 'ক্ষণিকবিজ্ঞান সমুচ্চয়'। পাশ্চাত্যে 'ক্রিটিক্যাল্' দর্শনের গুরু কাণ্টও শুদ্ধবিচার (Pure Reason) দিয়া আত্মা ঈশ্বর মূলপ্রকৃতির সত্যতা বা অস্তিত্ব প্রমাণ করা যে সম্ভব নয় তাহা দেখাইয়াছেন, এ-সকলকে তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন মানুষের আর-একটা বৃত্তির সহায়ে (Practical Reason). আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিরাও সন্দেহকে কখন জ্ঞানের ভিত্তি করিতে চাহেন নাই, তাঁহাদের মতে জ্ঞানের মূল জ্ঞানের আরম্ভ হইতেছে শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং। তাঁহারাও স্পষ্টই বলিয়াছেন সৎকে সত্তাকে সত্যকে বিচারের সহায়ে পাওয়া যায় না—নৈষা তর্কেণ মতিরাপণীয়া ; ও-বস্তুটিকে কেবল ঐ বস্তু দিয়াই ধরা যায়, আর কিছু দিয়া নয়—

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং।

এই Critical বা Experimental Methodএর প্রয়োগ যে দুইটি বিদ্যায় আজকাল খুব চলিতেছে তাহাদের কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্যটি স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে, ইতিহাস—বিশেষতঃ তাহার অনুষঙ্গী প্রত্নতত্ত্বের কথা। প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের 'বিজ্ঞানসম্মত' পন্থাটা কি ? গোড়ায় প্রয়োজন মনটাকে সকল-রকম সংস্কার পূর্ব্বকল্পনা পক্ষপাতিত্ব—

সকল দিকের সকল ঝোঁক হইতে মুক্ত করা, মনটা হইবে খালি (সেই tabula rasa); তারপর প্রয়োজন—অনুরাগ-বিরাগ-শূন্য হইয়া তথ্য সংগ্রহ করা—যে সময়ের ইতিহাস চাই সেই সময়-সংক্রান্ত ঘটনার অবস্থার চিহ্ন বা স্মারক যেখানে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা খুঁজিয়া পাতিয়া একত্র করিতে হইবে—কিম্বদন্তী হউক, সাহিত্য হউক, গাথা হউক, দলীল দান-পত্র মুদ্রা তাম্রশাসন হউক, শিল্প হউক কলা হউক—যতদূর সম্ভব সব জোগাড় করিতে হইবে ; তারপর সে-সব তুলনা করিতে হইবে, মিলাইতে হইবে, বাছাই করিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া সাজাইতে গুছাইতে হইবে—এই রকমে তাহার মধ্য হইতে গোটা একটি চিত্র বাহির করিতে হইবে। অন্যকথায় ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক সমস্যা হইতেছে এই—কয়েকখানি হাড় পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে পূর্ণাঙ্গ একটা জীব খাড়া করা যায় কি না, গেলে কি রকমের জীব সেটা হয় ? এখন, আমরা যদি বলি সবই নির্ভর করে হাত-সাফাইয়ের উপর, তবে খুব বেশী দোষ হয় কি ? অন্ততঃ এ-কথা বেশ বলিতে পারা যায় যে, শুধু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেয় কতকগুলি থিওরি মাত্র—বড় জোর, কোন্ থিওরি বেশী সঙ্গত, সে সম্বন্ধে একটা মতামত দিলেও দিতে পারে, কিন্তু কোন্‌টা খাঁটি সত্য—খাঁটি সত্য একটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ কি না, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারে না। ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিকট মল্লযুদ্ধ এ-কথা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। ফলতঃ 'বিজ্ঞানসম্মত' পন্থায় গোড়াতেই যে ত্রুটি গলদ রহিয়াছে, তাহা

যে এড়াইবার উপায় নাই, সেদিকে বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য করিতে চাহেন না। প্রথমতঃ সমস্ত উপকরণ পাওয়া অসম্ভব, সমস্তের একটা ক্ষুদ্র অংশের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ আছে ব্যক্তিগত দৃষ্টি-ভঙ্গী—personal equationএর কথা। বৈজ্ঞানিকের অর্থাৎ মানুষের মন খালি থাকিতে পারে না,—যখনই তুমি উপকরণ পাইয়াছ বা সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছ, এমন কি যখনই সে কার্য্যটি করিবে মনস্থ করিয়াছ, তখনই বা তাহার পূর্ব্বেই স্পষ্ট হউক আর অস্পষ্ট হউক—একটা মোটা ধারণা, একটা ছাঁচ তোমার মনে গড়িয়া উঠিয়াছে। এ-রকম ভাবে খাঁটি সত্য পাওয়া যে কত দুষ্কর তাহা দেখিয়া শুনিয়া মনীষী পণ্ডিত রেনাঁ (Renan) শেষ বয়সে এক রকম হাল ছাড়িয়া দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, "our poor little conjectural sciences" "আমাদের তুচ্ছ আন্দাজী বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র সব !"

তার পর হইতেছে সাহিত্যের কথা—আমি বিশেষভাবে কাব্যের কথাই বলিব। এখানে তর্কবুদ্ধির খেলা শুধু যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নয়, কাণ্ডজ্ঞানকে পর্য্যন্ত বলি দিতেও কসুর করে নাই। একটা উদাহরণ দিয়া জিনিষটি আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ধরুন রামায়ণের কথা। মূল রামায়ণ-খানা উদ্ধার করিতে হইবে—এখন তারও আগে প্রমাণ করা দরকার যে রামায়ণ বলিয়া একখানি গোটা কাব্য ছিল আর তাহা একজনের লেখা। এজন্য কি চাই? চাই যে দেশে

যেখানে যেখানে রামায়ণের পুঁথি আছে তাহা সংগ্রহ করা। তারপর দেখা, আভ্যন্তরিক প্রমাণ (internal evidence) অর্থাৎ পুঁথির ভিতরে স্পষ্ট (বা অস্পষ্ট) কোথায় কি রকম উল্লেখ আছে তাহা জোগাড় করিয়া মিলাইয়া সাজাইয়া কি বুঝা যায়। আভ্যন্তরিক প্রমাণ ছাড়া দেখিতে হইবে বাহ্যিক প্রমাণে (external evidence) কি পাওয়া যায়, অর্থাৎ অন্যান্য পুস্তকে দলীল-দস্তাবেজে অথবা কথায় কিম্বদন্তীতে কিছু নির্দ্দেশ (reference) আছে কি না? এই দুই প্রমাণ সম্মুখে রাখিয়া, তাহারই মাঝে মাঝে মিলাইয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে—পরখ করিতে হইবে রামায়ণ একজনের লেখা একখানি কাব্য কি না, হইলে ইহার কতখানি এক হাতের, আর কতখানি কত হাতের। কিন্তু কথা এই, এত আটঘাট সত্বেও এ-রকম প্রমাণ সম্পূর্ণ তৃপ্তিজনক বা নিশ্চয়াত্মক হইয়া উঠে না। চক্ষের উপরেই ত দেখিতেছি এ ধরণের তুঙ্গ সমালোচনা (Higher Criticism?) হোমর বলিয়া কোন কবির অস্তিত্ব পাইতেছেন না—ইলিয়ড হইতেছে বহু যুগ ধরিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গাথার সংগ্রহ মাত্র; সেক্‌স্‌পীয়র ছিলেন না, সেক্‌স্‌পীয়র হইতেছেন লর্ড বেকন। এ যেন সেই ভিষক্‌প্রবরের কথা যিনি শাস্ত্রের সূত্রে সূত্রে লক্ষণ মিলাইয়া প্রামণ করিয়া দিলেন যে জীবন্ত রোগীটি মারাই গিয়াছে। অথবা আমরা স্মরণ করিতে পারি মোলিয়েরের সেই ডাক্তারের কথা যিনি তারাচক্ষু করিয়া বলিতেছেন, "ডাক্তারের বিনা অনুমতিতে রোগী মারা যাইবে—বল কি অশাস্ত্রীয় কথা!"

থিওরি বা শাস্ত্র সময়ে সময়ে এই-রকম স্পষ্ট বাস্তব—factকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া ফেলে।

সে যাহা হউক, আমরা বলিতে চাই, তর্কবুদ্ধি সাহিত্যে (শুধু সাহিত্যে কেন সর্ব্ববিষয়ে) রুচি, রসবোধ—চলিত কথায়, 'সমঝ্দারী' জিনিষটি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। বাল্মীকিকে বাল্মীকির ভঙ্গী দেখিয়া চিনি না—কাব্যের মধ্যে কবির যে বিশেষ ছাপ (Roman hand) তাহা দেখিয়া কবিকে বাছিয়া লইতে পারি না, কবি ও কবির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করিতে পারি না। মানুষকে আমরা চিনিতে চাই গজকাঠি দিয়া—অর্থাৎ, তাহার মাথার ঘের মাপিয়া, নাকের উপর ফুটরুল চাপাইয়া, কপালের ক্ষেত্রফল কষিয়া, হাতপায়ের দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ জরীপ করিয়া। মানুষের পরিচয় লইতে আমাদের আশ্রয় সামুদ্রিক বিদ্যা। সামুদ্রিক বিদ্যায় কোন সত্য নাই, তাহা না-হয় না মানিলাম, কিন্তু মানুষের দিকে তাকাইলেই একটি চাহনিতে যে মানুষকে চেনা যায়, তাহার অন্তস্তল অবধি বুঝা যায়, এ কথাটা যে ভুলিতে বসিয়াছি, আমরা সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তর্কবুদ্ধির মূলদোষ এইখানে—জিনিষকে বুঝিতে হইলে সে প্রথমে তাহাকে ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া লয়, পরে সেই টুক্‌রাগুলি একত্র করিয়া জোড়া দিয়া জিনিষটি গড়িয়া তবে ধরিতে চায়। গোটা জিনিষটার উপর একটা গোটা নজর সে দিতে পারে না। তর্কবুদ্ধিরই সূত্র দিয়া বলিতে গেলে

আমরা বলিব, তর্কবুদ্ধি চলিতে চায় বিশেষ হইতে সাধারণে, ক্রমে ক্রমে। কারণ, তর্কবুদ্ধির ধর্ম্মই এই যে, সে এক ছাড়া দুইকে একত্রে ধারণ করিতে পারে না—'একসময়ে চোভয়ানবধারণং'—একে এক যোগ দিয়া তবে সে দুইএ পৌছায়; বিশেষই তাহার কাছে বিশেষভাবে সত্য, সাধারণ তাহার কাছে কতকগুলি বিশেষকে গাঁথিয়া রাখিবার উপায় মাত্র, সেটা তেমন জাগ্রত সত্য নয়, কেবল তত্ত্বমাত্র (abstraction). কিন্তু গোলমালের কথা এই যে, জগৎটা বিশেষের শুধু সমাহার নয়, অনন্ত (Infinite) সান্তের (finite) যোগফল মাত্র নয়—একটা একটানা গতির মধ্যে সব বিশেষ অনবরত মিলাইয়া যাইতেছে (বার্গ্‌সঁ; সর্ব্বং প্রাণে এজতি); শুধু তাই নয়, একটা সাধারণ—অদ্বিতীয় একত্বের মধ্যে সব বিশেষ এক হইয়া আছে। সুতরাং জিনিষকে বুঝিতে ধরিতে হইলে আরম্ভ করা যায় এই 'একং' হইতে—এই একং বা আত্মা বা নিত্য সত্তা হইতেই চলা যায় নানার বাহিরের প্রাতিভাসিকের দিকে, গতি হইতে ছন্দ হইতে প্রাণ হইতে চলা যায় স্থিতির মাত্রার জড়ের দিকে। অন্য কথায়, বিশেষ হইতে সাধারণে চলিবার যেমন একটি পথ আছে—সেটি হইতেছে তর্কবুদ্ধির পথ—তেমনি সাধারণ হইতে বিশেষে চলিবারও একটি পথ আছে—এটি হইতেছে Intuitive Method, সাক্ষাৎ উপলব্ধির পথ, 'সংযম'এর প্রণালী।

এখন, এই সাক্ষাৎজ্ঞান বা 'সংযমের' প্রণালীটি কি রকম? ইহার আছে তিনটি ধারা বা স্তর। প্রথম ধারণা অর্থাৎ যে

বিষয় জানিতে হইবে বুঝিতে হইবে তাহার উপর মনকে—শুধু মন নয়, মন বুদ্ধি ও সকল বৃত্তির যে প্রতিষ্ঠা সেই চিত্তকে—ফেলিতে হইবে, বাঁধিতে হইবে (১)। অন্য কথায় প্রথমে চাই সঙ্কল্প—আমাদের পূজা-আর্চ্চার বিধিতেও গোড়ায় করিতে হয় এই সঙ্কল্প। দ্বিতীয় হইতেছে ধ্যান অর্থাৎ সমস্ত চিত্তকে, চিত্তের স্রোতকে তন্মুখী ও তন্ময় করিয়া দিতে হইবে (২)। তৃতীয় হইতেছে সমাধি অর্থাৎ চিত্ত তাহাতে এমনভাবে ডুবিয়া যাইবে যে সেখানে জিনিষটীর পরিচিত বাহ্য রূপটি একরকম লোপ পায়, সেখানে কেবল ফুটিয়া উঠে জিনিষটির বস্তু, আসল সত্তা (৩)। এই তিনটী শক্তি লইয়া হইতেছে সংযমের শক্তি (৪)। সংযম দিয়াই অবিসম্বাদি জ্ঞান লাভ হয় (৫)। যে ক্ষেত্রেই হউক না কেন—শুধু পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নয়, লৌকিক আধিভৌতিক ক্ষেত্রেও এই সংযমের শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেখানকার বিচিত্র জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে (৬)। জিনিষের অন্তরাত্মার সহিত একীভূত হইতে হইবে, নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া জিনিষের অন্তরাত্মাকে ধরিতে হইবে। ভ্রমর যেমন ফুলের মধ্যে নিলীন হইয়া যায়,

(১) দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।
(২) তত্র প্রত্যৈকতানতা ধ্যানম্।
(৩) তদেব বস্তু মাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ।
(৪) ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।
(৫) তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।
(৬) তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ।

নিস্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়া মধুপানে বিভোর হইয়া যায়—সেইরকম মন-বুদ্ধিও তাহার সকল চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ স্তব্ধ করিয়া দিবে, মন-বুদ্ধির অন্তরালে আছে যে আত্মসত্তা যে পুরুষ সে-ই কেবল রসটি, রসাত্মক সত্যটি চুয়াইতে থাকিবে। প্রথমে প্রয়োজন মনের চিত্তের ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সঙ্কল্পের বীজ বপন করা ; তারপর তন্ময়তার ভাপে, অন্তরাত্মার তপঃ-আশ্লেষে সেই বীজকে অঙ্কুরিত করা, পল্লবে ফুলে ফলে পরিশেষে ফুটাইয়া তোলা। কেবল মন-বুদ্ধি দিয়া বাহ্য শরীরকেই—সত্যের হিরণ্ময় পাত্রটিকেই—পাওয়া যায় ; জিনিষের সত্য-স্বরূপকে পাইতে হইলে অন্তরাত্মা দিয়া অন্তরাত্মাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। আর জিনিষের সত্যস্বরূপ ধরিলে বুঝিলে তাহার প্রকাশের রূপ ধরিতে বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। 'তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং'—কথাটি অতিশয়োক্তি অলঙ্কার নয়, কথাটি স্বভাবোক্তি মাত্র।

জ্ঞানের আছে দুইটি বৃত্তি—বিচার ও বিবেক। আমাদের দোষ—বিচারকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলি আর বিবেককে এক-পাশে ফেলিয়া রাখি, নষ্ট হইতে দেই। কিন্তু বিবেকই জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানের গোড়া-ঘেঁষা বৃত্তি ; আর বিচার হইতেছে জ্ঞানের গৌণ বৃত্তি। বিবেক ও বিচারের পার্থক্য আমরা তিনটি দফায় বিবৃত করিতে পারি। প্রথমতঃ বিবেক হইতেছে স্বয়ম্প্রকাশ, কিন্তু বিচার তাহা নয় (ন তৎস্বাভাসং)। আমরা বাংলায় অনেক সময়ে ইংরাজী conscienceএর অর্থে বিবেক

শব্দটি ব্যবহার করি ; সংস্কৃতে বিবেকের দার্শনিক অর্থটি তাহা না হইলেও, এই দুইটি জিনিষের মধ্যে একটা বিশেষ সাদৃশ্য আছে। Conscience হইতেছে সেই বৃত্তি যাহা বিনা বিচারে আপনা হইতেই বলিয়া দেয় ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম কি, পাপ কি পুণ্য কি, সাধু কি অসাধু কি ; বিবেকও ঠিক সেইরকম বিনা-বিচারে আপনা হইতেই বলিয়া দেয় ভুল কি নির্ভুল কি, সত্য কি অসত্য কি। বিবেক হইতেছে একটা সাক্ষাৎ পরিচয়ের বৃত্তি ; আর এইজন্যই বিবেক ও বিচারের দ্বিতীয় পার্থক্য হইতেছে এই যে, বিবেকের মধ্যে ক্রম অর্থাৎ ধাপে ধাপে চলা নাই ('অক্রমং'), কিন্তু বিচার চলে একটা ক্রমানুসরণ করিয়া, একটির পর আর-একটি জিনিষ ধরিয়া ধরিয়া—কারণ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিচার যুগপৎ দুইটি জিনিষ ধারণ করিতে পারে না। পাশ্চাত্য দর্শনে Mediate ও Immediate knowledge বলিয়া দুইটি জিনিষের নির্দ্দেশ আছে ; আমরা বলিব, বিচার হইতেছে mediate—মধ্যবর্ত্তীর সহায় ছাড়া চলিতে পারে না, আর বিবেক হইতেছে immediate, নিরপেক্ষ, নিরালম্ব। একটা জিনিষকে ধরিতে বুঝিতে হইলে বিচার আর-দশটা জিনিষের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, চলিয়াছে ধীরে ধীরে ঘুরিয়া ফিরিয়া, শেষ লক্ষ্য বা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গোড়ায় সে কিছুই বলিতে পারে না, আপাততঃ যে লক্ষ্য বা সিদ্ধান্ত সে ধরিতে পায় তাহার অতিরিক্ত কিছু সে—অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তে—দেখিতে পায় না ; বিবেক কিন্তু সোজাসুজি জিনিষটির অন্তস্তলে যাইয়া

প্রবেশ করিয়াছে, আর-কোন জিনিষের উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে হয় না—উপনিষদের কথায়, শর যেমন লক্ষ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে, বিবেকের জ্ঞানও তেমনি জ্ঞেয়ের মধ্যে যাইয়া লাগিয়া মিশিয়া যায়—শরবৎতন্ময়ো ভবেৎ। বিচার ও বিবেকের তৃতীয় পার্থক্য হইতেছে এই যে বিচার দেয় খণ্ডের অনুভূতি, এক সময়ে একটি জিনিষের একই রকম জ্ঞান; কিন্তু বিবেকে পাই গোটার অনুভূতি, এক সময়ে এক জিনিষের বা বহু জিনিষের বহুল রূপের জ্ঞান—'এক-বহু-বহুধা'র সমন্বয় সম্মিলন হইতেছে বিবেকের জ্ঞান। সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথা বিষয়-মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্।

বিচার সত্যকে আবিষ্কার করে না; বিবেকই সত্যকে আবিষ্কার করে, বিচার পরে আসিয়া তাহার 'কেন' 'কিরূপে' বুঝাইয়া দেয়, প্রমাণ সংগ্রহ করে। বিবেক যেন জ্যামিতির উপপাদ্য (Theorem) আর বিচার হইতেছে তাহার উপপাদন (Demonstration—Q. E. D.). বিচার নিরর্থক নয়—বিচারের সার্থকতা আছে, কিন্তু কেবল তখনই যখন বিচারের পিছনে বিচারকে ধরিয়া থাকে বিবেক। বিচার যখন বিবেককে সাজাইয়া গুছাইয়া একটা বাহ্যরূপ দিয়া গোচর করিয়া ধরে তখনই বিচারে ফুটিয়া উঠে একটা স্থির সিদ্ধান্ত, একটা সুসিদ্ধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; বিবেকে যাহা সূক্ষ্ম—আত্মপ্রত্যয়গত, বিচার যদি তাহাকে স্থূলে প্রতিষ্ঠা করিয়া পরপ্রত্যয়গত করিয়া দেখাইতে পারে তবেই বিচারের সার্থকতা। নতুবা বিচার

হয় কেবল তর্কের ভেল্কী, কথার মারপ্যাঁচ—মনের চক্রাবর্ত্তন—অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।

এখন কথা হইতেছে, বিচার জিনিষটাকে বুঝি, মানুষের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব দেখি—কিন্তু কোথায় বিবেক? যে জিনিষ আছে, তাহা আছে সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায়। বিচারকে সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় পাই, কিন্তু বিবেককে পাই না কেন? বিবেক যদি মানুষের একটা বৃত্তি বা ধর্ম্ম, তবে মানুষের মনের যে সহজ সাধারণ খেলা তাহার মধ্যে ও-জিনিষটিকে পাওয়া চাই। কিন্তু ভগবানের মত বিবেককেও বলিতে ইচ্ছা হয় না কি, "Verily thou art a god that hidest thyself." তাই কি? ফলতঃ দেখি না কি, স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ বিবেক দিয়া যতখানি চলে, বিচার দিয়া ততখানি চলে না? মানুষ সব বিষয়েই সিদ্ধান্ত করে সোজাসুজি, অনুভূতির একটা সরল ঋজু প্রেরণায়—বিচার বিতর্ক যদি করে, তবে সেটা পরে, আগে নয়। কিন্তু, উত্তরে বলা হইবে, এ কথার অর্থ বিবেককে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সহিত এক করিয়া ফেলা, আর মানুষকে বিচারের হাত হইতে মুক্তি দিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়ের স্তরে নামাইয়া ফেলা বাঁধিয়া দেওয়া। সহজ মানুষ অনুভূতির আন্‌কোরা প্রেরণায় সোজাই চলে, সত্য; কিন্তু সেটি ত খাঁটি জিনিষ নয়, মানুষের ভ্রমপ্রমাদ এইরকমেই হয়—সহজ অনুভূতির ঝোঁক সাম্‌লাইয়া বিচারবুদ্ধির অনুসারে চলাই ত মনুষ্যত্ব, তাহা না হইলে, মানুষে আর ইতরপ্রাণীতে কোনই পার্থক্য থাকিত না। প্রত্যুত্তরে

যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি

আমাদের প্রথম কথা এই, ইতরপ্রাণী যে ইন্দ্রিয়ের সজাগ সহজ অনুভূতি দিয়া চলে তাহাতে তাহারা কখন ভুল করে না, ইতরপ্রাণীর মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় বা বস্তুর এমন একটা নিবিড় সংযোগ ও সামঞ্জস্য আছে যে ইন্দ্রিয়ের উপর দ্বিধাশূন্য নিষ্ঠা দ্বারাই তাহারা বিষয় বা বস্তুর উপর একটা সরল অটুট আধিপত্য স্থাপন করিতেছে। মানুষের মধ্যে বিচার বিতর্ক আসিয়া ইন্দ্রিয় ও বস্তুকে ভিন্ন করিয়া দিয়াছে, উভয়ের সংযোগ ও সামঞ্জস্যকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, একটা জোর-জবরদস্তির সংযোগ ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। দ্বিতীয় কথা এই, ইতরপ্রাণীর যে সহজ অব্যর্থ অনুভূতি আছে সেটা অন্ধ অজ্ঞান আর তাহার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ পশুর মন, তাহার প্রাণময় কোষের দাবী মিটাইবার জন্য অর্থাৎ আত্মরক্ষা ও আত্মদৃষ্টির জন্য ; তবুও যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু হিসাবে ততটুকুর মধ্যে পশুর মন বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি তীক্ষ্ণ সজাগ অসন্দিগ্ধ নির্ভুল। পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে তাহার মনোময় কোষ প্রাণময় কোষের এই আধিপত্য কাটাইয়া বিজ্ঞানময় কোষে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিতেছে ; মানুষের জীবপুরুষটি পশুর জীবপুরুষের মত অজ্ঞানে আপনাহারা হইয়া কিছু করিয়া যাইতে চাহিতেছে না, সে চাহিতেছে জ্ঞানকে সজ্ঞান করিতে, শুধু অনুভূতি নয়— অনুভূতিরও অনুভূতিকে জাগ্রত করিতে, মানুষের চেতনার ক্ষেত্রকে বৃহৎ ও বিচিত্র করিতে। পশু ও মানুষের পার্থক্য এইখানেই। সহজ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আত্মসংবিৎ'এ (self-con-

sciousness) প্রবুদ্ধ করিবার একটি অবলম্বন হইতেছে বিচার, —কিন্তু একটি অবলম্বন মাত্র। বিবেক হইতেছে আর-একটি অবলম্বন, শুধু তাই নয়, বিবেকই আসল খাঁটি অবলম্বন। বিচার আত্মার ও শরীরের মধ্যে, ইন্দ্রিয়ের আর বিষয়ের মধ্যে একটা অনৈক্য খাড়া করিয়া তোলে—কারণ আপনাকে জানা আত্মাকে চেনার আত্মসংবিৎ'এর প্রথম সোপান হইতেছে এই অনৈক্য, দ্বন্দ্ব (antithesis), এই পুরুষপ্রকৃতির ভেদজ্ঞান, নেতি নেতি। কিন্তু এই অনৈক্য দ্বন্দ্ব ভেদজ্ঞানই শেষ নয়—ভেদজ্ঞানের পরে থাকে, ভেদজ্ঞানের মধ্যেই নিহিত থাকে একটা নিবিড় ঐক্যজ্ঞান, নানাত্বের সত্যের মধ্যে যেখানে ছিল বা আছে কেবল দ্বন্দ্বেরই সত্য সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা প্রতিষ্ঠিত আছেই একটা সম্মিলনের সত্য। প্রথমে দেখা যায় প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সত্য, একের সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আছে অপরের সত্য—ইহাই বিচার-বিতর্কের কাজ; তারপর দেখা যায় প্রত্যেকের সত্য সত্য হইয়াই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত সম্মিলিত আছে—ইহাই বিবেকের কাজ।

বিচার ও বিবেক লইয়াই মানুষ মানুষ। তবে বিচার মানুষকে পশু হইতে একান্ত পৃথক করিয়া দিতেছে, বিবেক আবার উভয়ের মিলনসূত্রটি ধরাইয়া দিতেছে। বিচার প্রাকৃত সহজ অনুভূতিকে চাপিয়া দাবাইয়া রাখে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কেবল পরীক্ষা করে—বিবেকের মধ্যেই আবার সেই প্রাকৃত বৃত্তিটি অখণ্ড ভাবে রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিয়াছে। শুধু চেতনায়

(consciousness) যাহা সহজ অনুভূতি, আত্মচেতনায় (self-consciousness) তাহাই বিবেক। সুতরাং যখন বলি মানুষকে বিচার-বিতর্কের দাস হইলে চলিবে না, জাগাইতে হইবে শানাইয়া তুলিতে হইবে সহজ অনুভূতি, তাহার অর্থ ইহা নয় যে মানুষকে আবার পশুর স্তরে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাহার অর্থ হইতেছে এই যে ইতরপ্রাণীর সহজ অনুভূতিকে জাগ্রত করিতে হইবে অর্থাৎ আত্মচেতনা-সম্পন্ন করিতে হইবে, আর-একটা উচ্চতর বৃত্তিতে—বিবেকে পরিণত করিতে হইবে। আমরা 'হইবে' বলিতেছি, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু হইতেছেও ইহাই। পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি, মানুষ স্বভাবতই চলে একটা সহজ অনুভূতি ও বিবেকের প্রেরণায়, বিচার ঐ জিনিষটাকেই ফলাইয়া সাজাইয়া ধরিতে চায়। বিবেকেরও উপরে বিবেকেরও ভিতরে জ্ঞানের আরও সূক্ষ্মতর বৃত্তি আছে—যাহার নাম দিব্যদৃষ্টি Revelation কৈবল্যজ্ঞান (পতঞ্জলি বলিতেছেন বিবেক হইতেছে কৈবল্যের প্রাগ্‌ভাব)—কিন্তু সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের মধ্যে এই রকম স্তরে স্তরে একটির অন্তরে আর একটি বৃত্তি অনুস্যূত রহিয়াছে। মানুষের জ্ঞান বস্তুতঃ চলে অন্তরতম আশ্রয় হইতে ক্রমে বাহিরের আশ্রয়ের দিকে। কিন্তু ভিতরের গুলি থাকে গুপ্ত involved ; বিবর্ত্তনের স্তরে আমরা যত উপরে উঠিতে থাকি, ভিতরের বৃত্তি তত প্রকট evolved হইতে থাকে। পশুবৎ প্রাকৃত মানুষের মধ্যে প্রধানতঃ জাগ্রত স্ফুট হইতেছে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, আর সভ্য

শিক্ষিত মার্জ্জিতবুদ্ধি (cultured) মানুষের মধ্যে প্রাধান্য দেখিতে পাই বিচারের তর্কবুদ্ধির। মানুষের মধ্যে যাহারা আবার প্রতিভাবান, তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে তর্কবুদ্ধিরও উপরে আছে যে বিবেক, যে দিব্যদৃষ্টি। প্রতিভাবান ছাড়া অন্যত্র সাধারণের মধ্যে এই যে গুপ্ত সূক্ষ্ম বৃত্তি তাহা ফুটিয়া উঠে নাই, কারণ আপনার চেতনার জ্যোতিঃ ইহার উপর তাহারা প্রতিফলিত করায় নাই, ইহার উপর ধ্যান বা 'মনোযোগ' দেয় নাই, ইহার চর্চ্চা করে নাই, তাহারা তর্কবুদ্ধিরই উপর বেশী আস্থা স্থাপন করিতেছে, তর্কবুদ্ধি দিয়াই সে বৃত্তিটিকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। বিবর্ত্তনের একটা বিশেষ স্তরে, যুগধর্ম্মের ফলে বিচার-বিতর্কের প্রভুত্ব autocracy তাই স্থাপিত হইয়াছে।

গোড়ায় আমরা যন্ত্রপাতির কথা বলিতেছিলাম। আধুনিক জগতে অন্তঃকরণের মনের ক্ষেত্রে বিবেকের দৃষ্টির পরিবর্ত্তে বিচার-বিতর্কের প্রাধান্য হইয়াছে; ঠিক সেইজন্যই সেই রকমেই বাহিরে কর্ম্মের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই যুগ্মদ্বয়ের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে—তর্কবৃত্তির সহিত বিবেকের যে সম্বন্ধ, যন্ত্রপাতির সহিত ইন্দ্রিয়ের সেই সম্বন্ধ। বিবেকের ঋজুদৃষ্টি আর ইন্দ্রিয়ের সহজ অনুভূতি চলে এক সাথে, তর্কবুদ্ধির ক্রমানুসরণ শৃঙ্খলাবন্ধন আর যন্ত্রপাতির দৃঢ় আটঘাট চলে এক সাথে। বিবেক যে জ্ঞান দেয় তাহার মধ্যে আছে একটা অখণ্ডতা সমগ্রতা, একটা উদারতা

নিবিড়তা, একটা রসবোধ; আর তর্কবুদ্ধি যে জ্ঞান দেয় তাহা খণ্ডিত একদেশদর্শী, তাহা বাহিরের কাঠামের (formal). সজাগ কর্ম্মেন্দ্রিয় যাহা সৃষ্টি করে তাহার মধ্যে পাই জীবনের সজীব সরস সুন্দর আপীন চলন বলন; আর যন্ত্রপাতি যাহা গড়ে তাহা কাটাছাঁটা, অতিমাত্র মাপ-অনুযায়ী, শুষ্ক কঙ্কালবৎ, মনে হয় একটি যেন ছবি, আর-একটি জ্যামিতির রেখাঙ্কন (figure).

মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন আছে, যন্ত্রপাতিকেও যে একেবারেই তুলিয়া দিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু বিচারবুদ্ধি যে বৃত্তির অনুচর, সে বৃত্তির অনুচর না হইয়া যদি প্রভু হইয়া বসে, যন্ত্রপাতি যদি তাহার স্রষ্টাকে অতিক্রম করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে, তবে মানুষের কি ক্ষতি কি অমঙ্গল হয় সেই কথাটাই আমরা বলিতেছিলাম।

শ্রাবণ ১৩৪৮

ইউরোপের বনাম ভারতের জ্ঞানপন্থা

ইউরোপের দান হইতেছে সায়ান্‌স্‌ অর্থাৎ জিনিষের গতি সম্বন্ধে জ্ঞান, কার্য্যকারণ-পরম্পরার জ্ঞান। কোন জিনিষ লইয়া জিজ্ঞাসা উঠিলে ইউরোপীয় মনীষীরা তাহাকে দুই রকমে দেখিবার, তাহার মধ্যে দুইটা দিক পৃথক করিয়া লইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন—একটা হইতেছে চলন (Process) বা তাহার কর্ম্মের ধারা, আর একটা হইতেছে গড়ন (content) বা তাহার আধারের উপাদান বিশ্লেষণ ; একটা হইতেছে তাহার 'কি রকমে' (how), আর একটা হইতেছে তাহার 'কি' (what). জিনিষের এই দুইটি দিকের কথা বলিলেও, ইউরোপ তাহার প্রতিভা দেখাইয়াছে বিশেষভাবে 'কি রকমের', কর্ম্মপ্রণালীর আলোচনায়,—'কি'র উত্তর, বস্তু-সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান যাহা তাহা আসিয়াছে ঐ আলোচনার অনুষঙ্গী হিসাবে। জড় (matter) কি, বিদ্যুৎ (electricity) কি, ইউরোপীয় বিজ্ঞান তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, তবে যে জিনিষটা সে পারে তাহা হইতেছে ইহাদের কার্য্য-প্রণালীর কথা। আর সেইজন্যই, ইউরোপের তত্ত্বশাস্ত্রে (metaphysics)—যে শাস্ত্রের বিশেষ উদ্দেশ্য হইতেছে জিনিষের মূল সত্তা বা গড়ন

(content) সম্বন্ধে জ্ঞান, তাহা খুব উচ্চদরের নয়, সেখানে—ইউরোপের মন কেমন ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তন্ত্র-শাস্ত্রে (physics)—যেখানে পাই জিনিষের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা সেখানে —ইউরোপ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

ভারতের প্রতিভা ইহার ঠিক উল্টা রকমের। জিনিষটা কি, তাহার মধ্যে বস্তু কি, ভারতীয় মন বিশেষভাবে এই দিকটাই লইয়া মগ্ন—আমরা চাহি 'দ্রব্যজ্ঞান', কিন্তু জিনিষটা কি রকমে আসিল, কেমন করিয়া চলিয়াছে, সেই কর্ম্মশৃঙ্খলার পরম্পরার উপর আমাদের নজর তেমন পড়ে নাই। তাই ভারতে তত্ত্বজ্ঞান যতখানি দেখি, তন্ত্রজ্ঞান সেই অনুপাতে পাই না। ইউরোপ দেখিতেছে জিনিষের কলকব্জা, যাহার মধ্যে রহিয়াছে তাহার কর্ম্মের—তাহার জাতির রহস্য ; ভারতবর্ষ দেখিতেছে কি উপাদান বা ধাতু দিয়া জিনিষ গঠিত, সে যেন চাহিতেছে জিনিষের যে সত্তা বা স্থিতি তাহার রহস্য। কি করিলে কি হয়, গতির ধরণটি (Science বা Mechanism) সম্বন্ধে ভারতের মন উদাসীন ; এই করিলে এই হয়, ইহাতেই ভারতবর্ষ সন্তুষ্ট—সে চায় কি করিতে হইবে, তার ফল কি হইবে ; মাঝের রাস্তার খুঁটিনাটি তাহাকে বড় ব্যতিব্যস্ত করে না।

যে কোন বিষয়েই হউক না কেন আমাদের শাস্ত্র বা সূত্র বা বচন এই কথারই প্রমাণ দিতেছে। আমরা আমাদের জ্ঞানের ফলটিকে শাস্ত্রে সূত্রে বা বচনে লিপিবদ্ধ করিয়া

রাখিয়াছি, কিন্তু সেই জ্ঞানের প্রণালীটি মুছিয়া ফেলিয়াছি; আমরা আবিষ্কার করিয়াছি অনেক জিনিষই, কিন্তু যাহা আবিষ্কার করিলাম তাহাই মুখ ফুটিয়া বলিয়াছি, কি রকমে যে তাহা আবিষ্কার করিলাম বা অন্যে সেটি কি রকমে আবার আবিষ্কার বা পরীক্ষা করিতে পারিবে সেই পথটা সেই পথের অন্ধিসন্ধি সম্বন্ধে আমরা প্রায়শই নির্ব্বাক্। এই যেমন একটা বৈজ্ঞানিক সত্য আমরা সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছি—

চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি

ইহার হেতুবাদটা কি? অথবা যে কথাটা লইয়া ইউরোপীয় মনীষী-মহলে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা চলিতেছে, ইউরোপীয় মনীষী-দের পথ অবলম্বন করিয়াই আমাদের জগদীশচন্দ্র যাহার সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য বাহির করিতেছেন—উদ্ভিদেরও প্রাণ বা অনুভূতি আছে—সেই কথাটা মোটামুটি আমরা বহু পূর্ব্বেই সুস্পষ্ট বলিয়া দিয়াছি—

অন্তঃসংজ্ঞাভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ

কিন্তু কি রকমে, কি ধরণে, কোন্ কোন্ শক্তির সমাবেশে এই ঘটনাটি হয়, এই ব্যাপারটির বিচিত্র ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কোন কৌতুহল ছিল কি না সন্দেহের বিষয়। ভাস্করা-চার্য্য বলিয়া দিয়াছেন পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতের পরিমাণ কি—ইউরোপীয় গণিতজ্ঞেরা আশ্চর্য্য হইয়া যান যে, 'পাই'এর value নিরূপণ করিতে তাঁহাদের এত মাথা ঘামাইতে হইয়াছে, তাঁহাদের বহুপূর্ব্বে তাঁহাদের অপেক্ষাও ঠিক ঠিকভাবে

প্রাচীন ভারত সে জিনিষটি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু কি প্রণালীতে (process) যে এই অঙ্কটির সমাধান করা হইয়াছে তাহা যিনি সমাধান করিয়াছেন তিনি কিছুই বলিয়া যান নাই। সর্ব্বত্রই এই-রকম, খনার বচন হইতে গণিত জ্যোতিষ আয়ুর্ব্বেদ সকল স্থানেই আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথের কথায়, উক্তির প্রাদুর্ভাব, যুক্তিটা প্রায়ই উহ্য বা লুপ্ত। উক্তিটা যতই সত্য হউক না কেন, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া তাহাকে আমরা কেবল মানিয়াই লইতে পারি—প্রমাণের জন্য আমাদের ইউরোপেরই দ্বারস্থ হইতে হয়, ইউরোপের সায়ান্‌সের আলোকে তাহার মর্য্যাদার পরিমাপ করিতে হয়।

যাঁহারা মানিতে চাহেন না যে জড়বিজ্ঞান বা আধিভৌতিক বিষয়েও ইউরোপের কাছে ভারতের কিছু শিখিবার আছে, যাঁহারা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত যে অপরাবিদ্যাতেও, পার্থিব সৃষ্টিতেও ভারত ইউরোপেরই সমকক্ষ ছিল, তাঁহাদের মনোযোগ আমরা বিশেষরূপে এই কথাটির উপর আকর্ষণ করিতে চাই। আমরাও স্বীকার করি না যে ভারত কেবল অপার্থিব আত্মার মধ্যে ডুবিয়াছিল; ভারতের প্রতিভা খেলিয়াছে শুধু পরমার্থ তত্ত্ব লইয়া, জীবনের সামগ্রী সম্বন্ধে তাহার কোন জিজ্ঞাসাই ছিল না বা এ-বিষয়ে সে কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। অপরাবিদ্যার, চৌষট্টি কলার, জড়বিজ্ঞানের অনেক রহস্যই সে আবিষ্কার করিয়াছে; শুধু আবিষ্কার করে নাই, জীবনের ভোগৈশ্বর্য্যে তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়াছে, ফলাইয়াছে। কিন্তু

কথাটা এই যে, কি কি বস্তু ইউরোপের তুলনায় আমাদের জানা ছিল বা না ছিল, ইউরোপের চেয়ে কত বেশী সামগ্রী কত সুস্পষ্ট-তররূপে আমরা জীবনের কাজে লাগাইয়াছি বা না লাগাইয়াছি সেটা উভয়ের মনের পার্থক্য ততখানি দেখায় না, যতখানি দেখায় কি উপায়ে কি ধরণে আমরা সেই সেই বস্তু বা সামগ্রী পাইয়াছি, তাহাদের সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছি। ভারতের সমস্ত লক্ষ্য নিহিত যেন বস্তুর বা সামগ্রীর উপর; ইউরোপ নজর দিয়াছে তাহার ধরণ-ধারণটির উপর, তাহার হেতুবাদ, তাহার সায়ান্‌স্‌ বা মেকানিজম্‌এর উপর। ভারতবর্ষ বস্তুকে সামগ্রীকে পাইয়াছে মনে হয় যেন একটা নৈসর্গিক প্রতিভার বলে—instinct সহজ সংস্কারও বলিতে পার, intuition সূক্ষ্মদৃষ্টিও বলিতে পার; যাদুবিদ্যাও বলিতে পার; অথবা ঘটনাচক্রে, একটা আকস্মিক অতর্কিত মিলের ফলে; কিম্বা যদি সেখানে কোন তর্কবুদ্ধির, যুক্তির, পরীক্ষার প্রয়াস কিছু থাকিয়া থাকে তবে আবিষ্কারকেরা সে কথা একেবারে বাদ দিয়া দিয়াছেন; সিদ্ধান্তটি আমরা পাইয়াছি কিন্তু হেতুর অঙ্গগুলি আমাদের আবার নূতন করিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। এ যেন বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়। দেশীয় ভেষজবিদ্যায় আমরা জানি মাত্র এই ঔষধে এই ফল, কিন্তু কেমন করিয়া, তাহার ভিতরের প্রক্রিয়াটি কি, তাহার কেমিষ্ট্রি কি, তাহা আমাদের জানা নাই। রোগের নিদান কি সে সম্বন্ধে আমরা বায়ু পিত্ত কফ এই তিনটি মূলবস্তু লইয়াই সন্তুষ্ট। ইউরোপ কিন্তু এই ক্ষেত্রে রোগের বীজাণু পরমাণু আবিষ্কার

করিতে করিতে ব্যাক্‌টেরিওলজি নামে একটা পৃথক বিজ্ঞানই তৈয়ার করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। তাই ত অনেক বৈজ্ঞানিক বলিতে কুণ্ঠিত হন না যে আমাদের বিজ্ঞান হইতেছে empirical, ইউরোপের বিজ্ঞানই কেবল scientific অর্থাৎ প্রতিক্ষেত্রে ফল না দেখাইয়াও ইউরোপ বলিয়া দিতে পারে ফল এই হইবে, আমাদের কিন্তু 'ফলেন পরিচীয়তে' ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইউরোপের জিজ্ঞাসাবৃত্তি কার্য্যকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই, এমন কি কার্য্যের পিছনে কারণে পৌছিয়াই সে থামিয়া যায় নাই, সে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছে কারণ ও কার্য্যের সংযোগ-সেতুটা। নেপ্‌চুন গ্রহকে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে না দেখিয়া তাহার অস্তিত্বের কথা আগে হইতেই যে অনুমিত হইয়াছিল অথবা পরমাণুদের সংমিশ্রণের নিয়ম (Periodic law) হইতে যে নূতন নূতন মূলপদার্থের (element) অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অব্যর্থ ভবিষ্যৎবাণী সম্ভব হইয়াছে, ইউরোপের পক্ষে ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণের জন্যই তাহা খুব আশ্চর্য্যের নহে।

আপ্ত-বাক্যই যেখানে প্রধান প্রমাণ, প্রমাণের হেতুবাদটা যেখানে তেমন গণ্য করা হয় না, সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবস্থায় দুটি লক্ষণ আমরা দেখি। প্রথমতঃ সে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ফুটিয়া উঠে একটা স্থিতিশীলতার ভাব (static)—নূতন নূতন আবিষ্কার, প্রতিদিন নব নব রহস্যের উদ্‌ঘাটন আর সম্ভব হয় না; যে সত্য একবার পাইয়াছি তাহারই প্রয়োগে চর্ব্বিত চর্ব্বণে, তাহার যে-সকল উপসত্য এমন কি যে-সব সত্যাভাস

তাহাদের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া চলি—অভিনব পথ একটা কাটিয়া আর সহজে বাহির হওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ দেখি জ্ঞান-বিজ্ঞান সর্ব্বসাধারণে ছড়াইয়া পড়ে না, তাহা আবদ্ধ থাকে একটা বিশেষ শ্রেণীর বা সঙ্ঘের মধ্যে গুপ্তবিদ্যারূপে—ফলে ক্রমে সেটা লুপ্তবিদ্যা হইয়া পড়ে। ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে কতটা যে এই রকম ঘটিয়াছিল, তাহার হিসাব প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দিতে পারিবেন। ইউরোপও তাহার মধ্য-যুগে এই ধরণের অবস্থার ভিতর দিয়া আসিয়াছে—তখন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল অরিস্ততলের বাক্যের অনুবাদ টীকা ভাষ্য, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা আবদ্ধ ছিল খ্রীষ্টীয় চর্চ্চের যতীদের মধ্যে। কিন্তু ইউরোপের মনের উপর এই কালো পর্দ্দা রেনাসেন্স আন্দোলন আসিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিল—ইউরোপ পাইল তাহার নিজের প্রকৃতি। ইউরোপে যেটা ছিল ব্যতিক্রম, ভারতবর্ষে দেখি সেইটাই যেন নিয়ম।

ইউরোপের স্বভাব এই যে কোন সত্যকে বস্তু হিসাবে চিরন্তন সনাতন বলিয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না। আমরা একটা সত্যকে পাইলে, তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চাই, তাহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ; ইউরোপ কিন্তু তাহাকে মানিয়া লয় আপাততঃ সাময়িক ভাবে working hypothesis হিসাবে। কোন সত্যকে পাকাপাকি করিয়া লইবার ব্যস্ততা ইউরোপের নাই; সে আনন্দ পায় কেবল যেন experiment করিতে, সত্যকে নিত্য ভাঙ্গিতে চুরিতে, সে

চাহিতেছে সত্যের রূপ নয়, কিন্তু সত্যের ভঙ্গীটি। গীতার বাক্য 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' ভারত অপেক্ষা ইউরোপই যেন সম্যক্ পালন করিয়া আসিতেছে। আমাদের লোভ ফলের দিকে, একটা ধরাবাঁধা সত্যের দিকে, একটা কিছু সুস্পষ্ট বা নিরেট বস্তুর দিকে, যাহাকে ভর করিয়া চলা-ফেরা যায়—সে সত্য নির্ভুল হইলে ত কথাই নাই, নির্ভুল না হইলেও একেবারে বিষম প্রমাদ না হইলেই আমরা সেটিকে যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লই। বাহিরে হাজার pragmatic হইলেও ইউরোপের মন কিন্তু ঠিক সে ধরণের নয়, ফল সম্বন্ধে পরিণাম সম্বন্ধে নিত্য সত্য সম্বন্ধে, ইউরোপের মন সম্পূর্ণ খোলা, ফলে পরিণামে নিত্য সত্যে কি করিয়া পৌছান যায় সেই মাঝের কথাটা, উপায়ের, কর্ম্মের কথাটাই তাহার পক্ষে আসল। এই যেমন আমাদের তীর্থস্থান সব—কি দুর্গম দুরাসাধ্য স্থানে সে-সকল প্রতিষ্ঠিত—তীর্থস্থান আমরা করিয়াছি কিন্তু সেখানে পৌছিবার রাস্তাটা সম্বন্ধে আমরা একেবারে উদাসীন, রাস্তাটা কিছুই নয়, যেন তেন প্রকারেণ একবার লক্ষ্যে পৌছিলেই সব গোল চুকিয়া গেল। ইউরোপের ধরণ কিন্তু অন্যরকম, সে দেখে আগে রাস্তাটা, দেখিয়া শুনিয়া জরীপ করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া আগে সে তৈয়ার করিয়া লয় পাকা সড়ক—গতিবিধির সুবিধা করিয়া লইয়া তবে সে শহরের গম্যস্থানের দিকে নজর দেয়। যে দিকে ভাল রাস্তা চলে না, সে দিক হইতে বরং সে শহর উঠাইয়া

লইবে, কিন্তু ভাল রাস্তা বিনা শহর বসাইবে না। জ্ঞান-সম্বন্ধে, সত্য-সম্বন্ধেও তাহার সেই এক কথা—তাহাতে পৌঁছিবার রাস্তাটা বেশ আঁটাবাঁধা কি, না সেখানে ঝম্প দিয়া পৌঁছিতে হয়? যে জ্ঞানে যে সত্যে চলিবার নিবিড় নিরেট কার্য্যকারণ দ্বারা নাই বা দেখান হয় নাই, সে-জ্ঞান সে-সত্য যত বড় জ্ঞান যত বড় সত্য হউক না কেন—তাহা ব্রহ্মেরই হউক আর শুম্বেরই হউক সে-জ্ঞান সে-সত্য ভারতের জ্ঞান ভারতের সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইউরোপের জ্ঞান, ইউরোপের সত্য নয়।

শুধু অপরাবিদ্যা আধিভৌতিকের জ্ঞান নহে, এমন কি পরাবিদ্যা অধ্যাত্মের জ্ঞান—যেটা হইতেছে ভারতের প্রতিভার বিশেষ দান—সেখানেও পর্য্যন্ত ভারতের যে মনের ধারার কথা আমরা বলিলাম তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার ভাণ্ডার যে উপনিষদ্ তাহা সমস্তখানিই হইতেছে উপলব্ধির ফল-সমষ্টি, ঋষিরা যে-সকল সিদ্ধ অনুভূতি পাইয়াছিলেন তাহাদের আমরা তালিকা-সংগ্রহ বলিতে পারি। অবশ্য উপলব্ধিগুলি, অনুভূতিগুলি তাঁহারা সুচারুরূপে সাজাইয়া গুছাইয়াই বলিয়াছেন, তালিকাটি এলোমেলো লিষ্টি নয়, তলাইয়া দেখিলে সেখানে একটা লজিকেরই শৃঙ্খলা পাওয়া যায়; তবুও সে-সব হইতেছে গোটা বস্তুর কথা, বস্তুর গড়নের কথা, বস্তুর ভিতরকার কল-কব্জার কথা নয়, বস্তুর ভিতরকার শক্তি-সকলের ঘাত-প্রতিঘাতের ধারার কথা নয়। যেখানে পাই জ্ঞেয়ের তত্ত্ব, জ্ঞানের তত্ত্ব

সেখানে যথেষ্ট মিলে না। সেখানে প্রশ্ন, কি বিজিজ্ঞাসিতব্য; বিজ্ঞান কি রকমে, প্রশ্ন তাহা নয়। তুরীয় অবস্থা কাহাকে বলি অর্থাৎ তাহার উপাদান কি কি, ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণ কি কি, তাহা জানিলেই যেন আমাদের জিজ্ঞাসা-বৃত্তির নিবৃত্তি হয়। আমাদের জানিতে তেমন কৌতূহল হয় না, সাধারণ অবস্থার আর তুরীয় অবস্থার মাঝের সেতুটা কি, সাধারণ অবস্থাটা কি রকমে পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত হইতে হইতে তুরীয় অবস্থায় গিয়া পৌছিয়াছে, তুরীয় অবস্থার যে ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহা শক্তির কি রকম খেলায় নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত হইতেছে; ব্রহ্মজ্ঞের হালচাল কি? সেটা হইতেছে বাহিরের কথা; ভিতরের কথা হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞানের ধারাটা, তাহার dialectic কি রকমের—এটি আমাদের শাস্ত্রের প্রধান কথা নয়। ইউরোপের পরিভাষায় আমরা বলিতে পারি আমাদের দর্শন মূলতঃ ontological, আর ইউরোপীয় দর্শনের প্রধান কথা epistemological.

আমাদের এই সিদ্ধান্তে অনেকে হয়ত ইতস্ততঃ করিবেন—তাঁহারা বলিবেন, উপনিষদ্ সম্বন্ধে উহা খাটিলেও খাটিতে পারে, কারণ উপনিষদের উদ্দেশ্যই ছিল ঐরকম, কিন্তু উপনিষদের পরে দার্শনিক যুগের ষড়্দর্শন ও সে-সকলের বিপুল টীকা ও ভাষ্যাদি সম্মুখে রাখিয়া কে ও-কথা জোর করিয়া বলিতে পারে? থিওরী হিসাবে সাংখ্যে যে মানবমনের যন্ত্রপাতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে, প্রয়োগ হিসাবে যোগে যে অন্তঃকরণে রূপান্তরের

ধারার রহস্য পাই—সে-সব কি জিনিষের Mechanismএর কথা নয়, ইউরোপের সায়ান্স্ সে-সকলের মধ্যে জিজ্ঞাসার ফাঁক আর কি কিছু পাইতে পারে? উত্তরে আমরা বলিতে চাই, ভারত যেখানে জিনিষের Mechanism—কলকব্জার কথা বলিয়াছে, সেখানে কলকব্জার অংশগুলি খুলিয়া খুলিয়া দেখাইয়াছে কেবল—এই এতগুলি চাকা, এতগুলি স্ক্রু, এতগুলি বোল্টু, এতগুলি স্প্রিং; কিন্তু অংশগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত কি নিয়মে সংযুক্ত, কোন্ কার্য্য-পরম্পরার ফলে মোট জিনিষটার ধর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সেই law of causalityর কথা সেখানে তেমন পাই না—সেখানে পাই laws of being; কিন্তু laws of becoming আর-এক ধরণের জিনিষ। আমাদের প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রেই বস্তুর চুল-চেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হদিস আছে—তা সে অন্তর্জগতের বস্তু হউক আর বহির্জগতের বস্তু হউক; কিন্তু সে-সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বস্তুনির্দ্দেশ মাত্র, প্রত্যেককে চিনিবার একটা সংজ্ঞা খাড়া করিয়াই যেন আমরা খালাস। কিন্তু তাহাদের ক্রম-পরিণতির ধারা, তাহাদের অন্তঃস্থিত শক্তিরাজির লীলাগতি আমাদের জিজ্ঞাসাকে তেমন প্রবুদ্ধ করিতে পারে নাই।

যোগ-সাধনায় আমাদের মনে শক্তির একটা সূক্ষ্ম লীলার রহস্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সত্য কথা। কিন্তু এখানেও লক্ষ্য ছিল শক্তির ফলের দিকে, সিদ্ধির দিকে; রূপান্তরের কার্য্যটার উপরই বিশেষ জোর আমরা দিয়াছি, রূপান্তরের কারণটার

অঙ্কি-সন্ধি তলাইয়া দেখিবার প্রয়োজন আমরা বোধ করি নাই। আমাদের বলা হইল—চিত্ত স্থির হইলে সেখানে ফুটিয়া উঠে আত্মার স্বরূপ। চিত্ত কি রকম বস্তু তাহারও ব্যাখ্যা দেওয়া হইল; আত্মা কি ধরণের জিনিষ তাহাও যতদূর সম্ভব বুঝাইয়া দেওয়া হইল; কি উপায়ে চিত্ত স্থির করিতে হইবে, তাহার পর্য্যন্ত আটঘাট (অষ্টাঙ্গমার্গ) বাঁধিয়া দেওয়া হইল। এই পন্থা অনুসরণ করিয়া ব্যবস্থামত ফলও আমরা লাভ করিলাম। কিন্তু এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটির রহস্য কি, কেমন করিয়া যে ইহা ঘটিল, সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ববৎ অজ্ঞই রহিলাম। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, এই দুইটি পৃথক বস্তুকে একটি কাঁচের পাত্রে একত্র করিলাম আর তাহার ভিতর দিয়া একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালাইয়া দিলাম—ফলে পাইলাম জল; কিন্তু এ ঘটনার কেমিষ্ট্রীটা কি সে-দিকে নজর দিলাম না। শ্রীরাম-কৃষ্ণের উপদেশ-মত আমরা আম-বাগানে ঢুকিয়া আম খাইয়াই সন্তুষ্ট, কিন্তু সেখানে কয়টা কতরকমের কি রকমের আম গাছ আছে সেটা জানা আমরা নেহাৎ অবান্তর জিনিষ বলিয়া মনে করি।

যোগে অষ্টসিদ্ধি বা ঐশ্বর্য্যের কথা আছে। দূরশ্রবণ, দূর-দর্শন, শরীরকে ইচ্ছামত হাল্কা বা ভারী করা প্রভৃতি নানারকম অদ্ভুত শক্তি যোগসাধনায় হয়,—অন্ততঃ এই রকম বলা হইয়াছে। অনেক যোগী এ-রকম সম্পদ্ যে লাভ করিয়াছেন তাহারও প্রমাণ যে সব সময়ে উড়াইয়া দিবার উপযুক্ত এমনও বলা চলে

না। কিন্তু কেন এ-রকম হয়, যোগসাধনায় শরীরের কি কি পরিবর্ত্তন কি রকমে ঘটিতে বাধ্য, আর এই-সব পরিবর্ত্তনের ফলে কি রকমে পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ অত্যদ্ভুত শক্তি অব্যর্থভাবে ফুটিয়া উঠে—এ-সকল কথার সদুত্তর আমাদের যোগী-ঋষিরা যে দিতে পারিবেন তাহা মনে হয় না। তাঁহারা হয়ত শুধু বলিবেন—সূর্য্য উঠিলেই আলো হয়, ইহার আবার ব্যাখ্যা কি, ইহা ত অবিসম্বাদী স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু এই স্বতঃ-সিদ্ধ ব্যাপারেরও যে কি রকমে ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহার নিদর্শন ইউরোপ দিতেছে। 'ভূতুড়ে কাণ্ডের' বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লইয়া ইউরোপে আজকাল যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, তাহার সংবাদ অনেকেই জানেন নিশ্চয়; আর এই রকমে তাঁহারা যে কত অদৃষ্ট-পূর্ব্ব তথ্যের আবিষ্কার করিতেছেন তাহা দেখিয়া শুনিয়া স্তব্ধ হইয়াই যাইতে হয়।

অথবা ধরুন মন্ত্রশক্তির কথা। মন্ত্রের যে একটা শক্তি আছে, শব্দের যথাযথ সংযোজনের ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণের যে একটা সৃজনের রূপ-গড়নের সামর্থ্য আছে, সে তথ্য আমাদের প্রাচীনেরা পাইয়াছিলেন, এ তথ্যটি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাঁহারা করিয়াছেন, ইহার প্রয়োগ অনেক দেখাইয়া-ছেন, কিন্তু উহাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্যভাবে ধরিয়া; গোড়ায় ওটিকে যেন মানিয়া লইয়া তবে উহার ডালপালা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। এ তথ্যটি যে সত্য, ইহার গোপন রহস্য যে একটা অব্যর্থ কার্য্য-কারণ-পরম্পরায় বাঁধা তাহার প্রমাণটি

আমরা আজকাল পাইতেছি ইউরোপের ধ্বনি-বিজ্ঞান (Accoustics) হইতে ; ইহার সমস্ত ব্যঞ্জনা উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়া ইউরোপই ভারতের এই উপলব্ধির মূল্য ও মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিতেছে।

ইউরোপ জিনিষের ফিজিওলজি খুঁজিতেছে বলিয়া জিনিষের এনাটমি সম্বন্ধে গবেষণা আর তাহার শেষ হইতেছে না ; তাই সে ফিজিক্সের তথ্য খুঁড়িতে খুঁড়িতে কেমিষ্ট্রির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারের মধ্যে তলাইয়া যাইতেছে। জিনিষের মূল পদার্থের জন্য আমরা পঞ্চভূত লইয়াই সন্তুষ্ট ; ইউরোপেরও আগে ছিল পঞ্চ নয় চারিটি ভূত মাত্র। কিন্তু এই চারিভূত ভাঙ্গিয়া তাহারা বাহির করিল বাহাত্তরটি মৌলিক পদার্থ (chemical elements) ; সম্প্রতি আবার এই মৌলিক পদার্থের পরমাণুকেও (atom) ভাঙ্গিয়া সে বাহির করিয়াছে ইলেকট্রন্। আমরা হয়ত এই পর্য্যন্তই আসিয়া থামিয়া যাইতাম, বলিতাম ইহাই যথেষ্ট ; ইউরোপে কিন্তু থামার চিহ্নও দেখি না, সে আরও চলিয়াছে। ইলেকট্রন্‌গুলির ওজন কত, তাহারা কি রকমে সজ্জিত, তাহাদের গতিবেগ কত—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের যে অঙ্কশাস্ত্র তাহাই ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার আধুনিকতম সমস্যা। জগতের জিনিষের কলকব্জার রহস্য বুঝিতে ইউরোপ যে আরও কোথায় কতদূর চলিবে তাহার ঠিক ঠিকানা কি ?

ইউরোপের সায়ান্স্ বলিতে আসলে বুঝায় মনের বুদ্ধির

এই ধরণটা, যাহার বশে সে চলে জিনিষের শৃঙ্খলাসূত্রের ধারাবাহিক আঁকবাঁক অনুসরণ করিয়া। ইউরোপের সায়ান্সের বিশেষত্ব জড়ের জ্ঞান নয়, নূতন নূতন পদার্থের আবিষ্কার নয়—ইউরোপের সায়ান্সের বিশেষত্ব হইতেছে scientific method—বৈজ্ঞানিক প্রণালী। এই প্রণালীর দুইটি মোটা কথা—প্রথম এই যে, facts বা বস্তু সংগ্রহ করিতে হইবে যতদূর যতরকমের পারা যায়—আর দ্বিতীয় এই যে, বস্তুতে বস্তুতে নিবিড় সম্বন্ধের সূত্রটা খুলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে সায়ান্সের ঝোঁক বিশেষভাবে হইতেছে শেষোক্তটির উপর। ইউরোপ বস্তু যোগাড় করিতেছে, ঐ সম্বন্ধের লীলাভঙ্গী বুঝিবার জন্য, ঐ সম্বন্ধেরই লীলাভঙ্গী উদাহরণের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া ধরিবার জন্যই সে বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

তবে ইউরোপীয় সায়ান্সের অথবা Scientific Methodএর সঙ্কীর্ণতা এইখানে যে সে জিনিষের সম্বন্ধের খোঁজ করে দেহেরই মধ্যে। স্থূল সম্বন্ধে সন্তুষ্ট না হইয়া যতই সে সূক্ষ্ম সম্বন্ধের খোঁজে চলিয়াছে ততই সে শুধু দেহকেই কাটিয়া কাটিয়া দেহেরই অণু হইতে অণুর দিকে চলিয়াছে। নূতনতর নিবিড়তর সম্বন্ধ আবিষ্কারের জন্য সে যে-সব বস্তু নাড়িতেছে চাড়িতেছে তাহা সবই দেহাত্মক বস্তু। এই দেহাত্মজ্ঞান ইউরোপীয় সায়ান্স ছাড়াইয়া উঠিতে পারিতেছেও না, চাহিতেছেও না। সায়ান্সের দৃষ্টি চলিয়াছে বাহিরের দিকে, ভিতরের দিকে ডুবিতে ডুবিতেও

তাই আবার ভাসিয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। দেহকে কাটিয়া কাটিয়া সে এমন একটা জায়গায় পৌছিয়াছে যে সেখান হইতে আরও চলিলে তাহাকে দেহাতিরিক্ত আর-একটু কিছু বস্তু-জগতের মধ্যে যাইয়া পড়িতে হয়—কিন্তু জড় মন লইয়া ইউরোপীয় সায়ান্স সে ধাপ আর পার হইতে পারিতেছে না, দূর হইতেই সেই দেহাতিরিক্ত প্রতিষ্ঠানের লীলাখেলা অনুমানে ধরিতে চাহিতেছে, দৈহিক সত্যের ছাঁচে সেগুলিকে ঢালাই করিতেছে।

জ্ঞানের পথে ইউরোপ চলিয়াছে দুইটি আলোকবর্ত্তিকা লইয়া—দুইটি বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া (১) স্থূল ইন্দ্রিয় আর (২) তর্কবুদ্ধি। স্থূল ইন্দ্রিয় দিতেছে বস্তু বা facts আর তর্কবুদ্ধি দিতেছে বস্তুশৃঙ্খলার সূত্র। কিন্তু স্থূল ইন্দ্রিয় যে বস্তুরাশি জ্ঞানগোচর করিয়া ধরে তাহা একদিকে সসীম সঙ্কীর্ণ, আর একদিকে কাটা-কাটা ছাড়া-ছাড়া। স্বভাবতঃই ও সহজেই তাই ইউরোপ সেগুলির শৃঙ্খলার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের দিকে ঝোঁক দিতে পারিয়াছে।

ভারত বস্তুর শৃঙ্খলা-সূত্রের, কার্য্য-কারণ-পরম্পরার রহস্যের দিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারে নাই, তাহার কারণ এই যে—জ্ঞানের জন্য সে এমন একটা বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াছে, যাহার সম্মুখে বস্তু অসংখ্য অজস্র ধারায় কেবলই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই নব নব বস্তু আবিষ্কারের আনন্দে সে এত মজিয়া মত্ত হইয়া গিয়াছে যে অন্য দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া তাহার পক্ষে ঘটিয়া উঠে নাই। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি

ভারত জ্ঞানের পথে চলিয়াছে যেন কি একটা সূক্ষ্ম সহজাত অনুভবের প্রেরণায়—সেই কথাটাই একটু বিশদ করিয়া বলিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে।

একটা জিনিষ সকলেরই নজরে পড়িবে—পড়িয়াছেও—যে আমাদের দেশে সকল শাস্ত্র—নিতান্ত আধিভৌতিক বিষয়ের শাস্ত্র পর্য্যন্ত—আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সকল বিদ্যাকে—অপরাবিদ্যাকেও—ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যারই উপায় বা সোপান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রই বল আর জ্যোতিষ-শাস্ত্রই বল অথবা আয়ুর্ব্বিদ্যাই বল—তাহারা কি প্রকারে মোক্ষপ্রদ, এই ভণিতা দিয়া সকলেরই ব্যাখ্যান সুরু করা হয়। ইহার অর্থ এই যে কোন জ্ঞানকেই একান্ত লৌকিক (secular) দৃষ্টি দিয়া আমরা দেখি না। সকল জ্ঞানই আমরা লাভ করিতে চাই পার্থিব অনুভব দিয়া নয়, কিন্তু একটা অতীন্দ্রিয় আলোকের ব্যঞ্জনায়। পক্ষান্তরে দেখি ইউরোপ তাহার সায়ান্স্‌কে ইন্দ্রিয়-বদ্ধ ইহমুখী—যতদূর পারে secularই—করিয়া রাখিতে চায়। অতীন্দ্রিয়ের বা অধ্যাত্মের জগৎ হইতে বিজ্ঞানের জগৎ সে একেবারে আলাদা করিয়া তবে পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণা করিতে চায়। তাহার মতে অতীন্দ্রিয়ের অধ্যাত্মের কোন-রকম ভাবভঙ্গী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্যে আনিয়া ফেলা হইতেছে—ভেজাল দেওয়া, দুইটি বিভিন্ন রকমের বস্তুকে মিশাইয়া গোলমাল সৃষ্টি করা।

ভারতের জ্ঞানপন্থা

ভারতের পথটি আমরা যে ধরণের বলিলাম, তাহার নিদর্শন দেখি আর-এক ব্যাপারের মধ্যে। ভারতের যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা আবার সাধক অর্থাৎ তাঁহারা কেবল মস্তিষ্কেরই চালনা বা চর্চ্চা করেন না, তাঁহারা জীবনকেও কোন না কোন রকম তপশ্চর্য্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গঠিত করিতে চেষ্টা করেন। আমাদের দেশে যোগী-ঋষিরাই জ্ঞানী। আধিভৌতিক বিষয়েও যাঁহারা জ্ঞান দিয়াছেন, শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও ছিলেন যোগী ঋষি সাধক। আধুনিক কালেও দেখিতে পাই ভারতের প্রাচীন জ্ঞান লইয়া যাঁহারা আছেন, ভারতের প্রাচীন জ্ঞানের পথে যাঁহারা চলিতেছেন, সেই ব্রাহ্মণদিগের (এবং কবিরাজদিগের) মধ্যেই পূর্ব্বতন ধারার চিহ্ন কিছু বর্ত্তমান আছে। সেখানেও অন্তরের সাধনা বোধ হয় লোপ পাইয়াছে, কিন্তু বাহিরের আচার ক্রিয়া এখনও তাঁহারাই বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন; এবং শ্রেণী হিসাবে এখনও বোধ হয় তাঁহাদেরই মধ্যে বেশী ও বিশেষভাবে পাই একটা শুদ্ধ সাত্ত্বিকতার আভাস।

আমাদের জ্ঞানীরা ছিলেন আচারসম্পন্ন, ক্রিয়াবান্ নিষ্ঠাবান্। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আবার শ্রেষ্ঠ তাঁহারা ছিলেন যোগী ও সাধক। তাই তাঁহারা ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ তাঁহাদের আধার ধৌত পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের মনবুদ্ধি একটা প্রশান্ত স্বচ্ছতায় ভরিয়া গিয়াছিল, তাই সেখানে দেখা দিয়াছিল একটা সূক্ষ্মতর বৃত্তি, বাহিক ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রের

সাহায্য বিনাও যাহা সহজে ও সোজাসুজি ভাবে জিনিষের তথ্য নির্ণয় করিয়া দিত। এই সূক্ষ্মতর বৃত্তির আধুনিক নাম হইতেছে Psychic perception—বাংলায় আমরা বলিতে পারি 'তন্মাত্রিক অনুভূতি' অথবা শুধু সূক্ষ্ম অনুভূতি। ইহা আধ্যাত্মিক দিব্যদৃষ্টি নয়, ইহা হইতেছে এক-রকম একাগ্র চেতনা, তীক্ষ্ণ ধারাল অনুভবশক্তি। এই-রকমের একটা জিনিষ এখনও মাঝে মাঝে আমরা দেখিতে পাই যাহাদিগকে বলা হয় Prodigies বা বালক জ্ঞানী তাহাদের মধ্যে। এমন শিশু বা বালকের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি যাহারা অঙ্কশাস্ত্রে কোন-রকম শিক্ষা না পাইয়াও—এমন কি অপরিণত বুদ্ধি লইয়াও—শুধু মুখে-মুখে বা মনে-মনে কঠিন এবং বৃহৎ অঙ্ক-সব অবলীলাক্রমে কষিয়া দিয়াছে। তাহারা অঙ্কের ফলটা অল্প সময়ের মধ্যে হুবহু ঠিক বলিয়া দিতে পারে—কিন্তু প্রণালীর বেলায় চলে একটা অভিনব সংক্ষিপ্ত পথ ধরিয়া। আমরা যাহাকে psychic perception নাম দিয়াছি, আমাদের জ্ঞানীরা জ্ঞানের জন্য যে পথে চলিতেন তাহারও ধরণ কতকটা ঐ রকমেরই ছিল। তাঁহাদের অনুভূতি সোজাসুজি, যেন তড়িৎ-বেগে, জ্ঞানের ফলের দিকে ধাইয়া চলিত; এই চলার একটা বিশেষ ধারা (process) থাকিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা থাকিত অন্তর্লীন গুপ্ত ধারার মত (concentrated and involved). তাই সেখানে জোরটা পড়িত ফলের বা বস্তুর উপর, প্রণালীর বা চলনের উপর নয়।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীরা সব জ্ঞানই আহরণ করিতেন এই সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে। আধিভৌতিক অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক বিষয়েও এই বৃত্তিটীর আশ্রয় তাঁহারা লইতেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাতে-কলমেও পরীক্ষণ পরীক্ষাদি (observation and experiment) যে করিতেন না তাহা নয়। এ বিষয়েও তাঁহাদের যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে সূক্ষ্ম অনুভূতির ধারা ও ধর্ম্ম তাঁহাদের মনের উপর এমন একটা ছাপ দিয়া গিয়াছিল যে হাতে-কলমের স্থূল ক্ষেত্রেও তাঁহারা সেই ধারায় ও সেই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিতেন। এ-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পথেও তাই তাঁহাদের দৃষ্টি ফলের উপর যতখানি গিয়া পড়িয়াছে, সেই ফলটা যে আসিল কেমন করিয়া তাহার প্রণালীর উপর ততখানি পড়ে নাই। তাই তাঁহাদের সিদ্ধি দেখিয়া আমরা চমকিত হইয়া পড়ি, কারণ সাধনার ধারার রহস্যটী তাঁহারা একেবারে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, লোপ করিয়া দিয়াছেন।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পন্থা হইতে ভারতের এইটুকু শিখিবার, আয়ত্ত করিবার আছে। ইউরোপের বিজ্ঞানের মত জড়মুখী ইন্দ্রিয়াবলম্বী হইয়া ভারতের কোন লাভ নাই। ভারতের সেই প্রাচীন সূক্ষ্ম অনুভূতি সজাগ রাখিতে হইবে—কিন্তু তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সেই কার্য্য-কারণ-পরম্পরা ধরিবার—প্রকট করিবার—প্রতিভা। বৈদিক ঋষিগণ যাহাকে ঋতম্ বলিতেন অর্থাৎ জিনিষের নামরূপ

নয়, এমন কি তাহার সত্যটিও নয়, কিন্তু নামরূপের পিছনে সে সত্যের যে সত্য ছন্দ, যে নিবিড় গতিভঙ্গী তাহাকে বিশ্বলীলার মধ্যে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে সেইখানেই রহিয়াছে সকল উত্তম রহস্য। এই দিব্য ছন্দতত্ত্ব অধিকার করিতে হইলে চাই ভারতের অন্তর্দৃষ্টি আর সেই অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে চাই ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ভঙ্গী।

আষাঢ়, ১৩৩০

সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা

মানুষ কেবল চক্ষু দিয়াই দেখে না, কান দিয়াই শোনে না, নাক দিয়াই গন্ধ পায় না, জিহ্বা দিয়াই আস্বাদ পায় না বা ত্বক্ দিয়াই স্পর্শ পায় না। এই সব ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের দেওয়া পরিচয়ের মধ্যে আবার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া জিনিষ বুঝিতে চাহিতেছে যে মন, সেই মন দিয়াও কেবল মানুষ বোঝে না। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়-যন্ত্রগুলির কথাই ধরা যাক্। ইহারাই যদি অনুভূতির একমাত্র অপরিহার্য্য উপায় হইত, তবে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নের মধ্যে হুবহু জাগ্রতেরই অভিনয় হয় কি রকমে? চক্ষু যখন বন্ধ থাকে তখন এমন সুস্পষ্ট বহুল চিত্র সব দেখা যায় কি রকমে? বাহিরে কোন শব্দ হইতেছে না অথচ তখন ধ্বনি, কথা, সুর একই ভাবে শোনা যাইতেছে, কোন গন্ধযুক্ত পদার্থ কাছে নাই অথচ একই রকম তীব্র গন্ধ পাওয়া যাইতেছে, সুভোজ্য পদার্থ বাস্তবিক নাই অথচ কি রুচি সহকারে রস গ্রহণ করা হইতেছে, প্রিয়জন কাছে নাই অথচ স্পর্শে শিহরিয়াই উঠিতেছি। কেন এমন হয়? বাহ্য ইন্দ্রিয় কোনই কাজ করিতেছে না, অথচ তাহাদের কাজের ফলটি ঠিক ঠিক আসিতেছে কোথা হইতে? বলা যাইতে পারে, এ সব হইতেছে স্মৃতির কাজ। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় শুধু স্মৃতি দিয়া

চেষ্টা কর দেখি তোমার পূর্ব্বপরিচিত একটা অনুভূতিকে আবার স্পষ্ট করিয়া পূর্ব্বেরই মত অনুভব করিতে। কই, পার না ত! এ রকম স্মৃতি ত কল্পনার চেষ্টা মাত্র—জাগ্রতের স্পষ্টতা অব্যর্থতা নিঃসন্দিগ্ধতা সেখানে নাই। যদি বল, এ স্মৃতি হইতেছে মজ্জিত স্মৃতি জাগ্রত-অনুভূতির রেশ (after-sensation), কিন্তু তার মানে কি? এ ত এক রকমে আমাদের কথাটিই ফিরিয়া বলা হইতেছে। কারণ ইহাতে স্বীকার করা হইল স্মৃতি মজ্জিত হইতে পারে, জাগ্রত-অনুভূতি একটা জায়গায় গিয়া সব জড় হইতে পারে ও সেখান হইতে বাহ্য যন্ত্রের সহায় ব্যতিরেকেও আবার পূর্ব্বের স্বরূপ লইয়াই উঠিয়া আসিতে পারে। দাঁড়াইল তবে, ইন্দ্রিয়ের বাহিরের যন্ত্র ছাড়া, আছে এক জায়গায় একটা ইন্দ্রিয়-অনুভূতির ভাণ্ডার। কিন্তু প্রশ্ন—কোথায় সেই ভাণ্ডার, কি রকম তাহা, কেন কি রকমে অনুভূতি সব সেখানে গিয়া জমিতে থাকে, কি রকমে তাহারা বাহিরের আঘাত ব্যতিরেকেই আবার উঠিয়া আসে?

এ ভাণ্ডার কি মানুষের মগজ (brain)? মগজই যদি একমাত্র নিমিত্ত হইত তবে জাগ্রতে একটা পরিচিত অনুভূতির কল্পনা আর স্বপ্নে সেই অনুভূতির পুনরনুভব এই দুই এর পার্থক্য আসে কোথা হইতে? কারণ মগজে এই দুটি জিনিষই ত স্থান পায়। বলা যাইতে পারে, এ পার্থক্যের কারণ প্রথমতঃ এই যে, স্বপ্নে জাগিয়া ভাসিয়া উঠে মগজের নিবিড়তর গভীর-তর স্তরের অনুভূতি, তাই সে সব এত স্পষ্ট আর দ্বিতীয়তঃ

এই যে, জাগ্রতে অবান্তর অন্যান্য অনুভূতি বাহির হইতে আসিয়া সেই মগজের ভিতরে লুক্কায়িত অনুভূতিকে মুছিয়া অস্পষ্ট করিয়া দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাপারটি যদি কেবল জানা-অনুভূতির পুনঃ-চিত্রণের কথা হইত তবে এ মীমাংসা না হয় মানিলেও মানা যাইত। কিন্তু তাহা ত নয়। আমরা আর একটা ব্যাপার দেখি এই যে, সব সময়ে পূর্ব্ব-পরিচিত অনুভূতিই আবার যে অনুভবে আসে তা নয়, সম্পূর্ণ নূতন অনুভূতি, বাহ্য ইন্দ্রিয় কখন যাহাকে আনিয়া দেয় নাই বা দিতে পারে না, তাহাও আমাদের অনুভব হয়। এ যেন ভিতরে কোথায় অনুভূতির নিরালম্ব নিরপেক্ষ সৃষ্টি। আজকালকার Psychical Science যে-সব নূতন নূতন অদ্ভুত ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার উদাহরণ জোগাড় করিয়াছে ও করিতেছে তাহা আর উড়াইয়া দিবার জিনিষ নয়। সম্মোহনের (hypnosis), একরকম সমাধির (trance) অবস্থায় বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে, পূর্ব্বপরিচিত অনুভূতি ছাড়াও যে মানুষ অভিনব অনুভূতি সব পায় তাহা ত প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ভাষা হঠাৎ অনর্গল বলা বা লেখা, অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার তর্কবিতর্ক করা, দূরের জিনিষ দেখা ও শোনা, অতীতকে পুনরুদ্ধার করা, ভবিষ্যতকে হুবহু বলিয়া দেওয়া—এসব যে অসম্ভব জিনিষ তাহা ঘোর বৈজ্ঞানিক যাঁহারা তাঁহারাও আর জোর করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। মগজের মধ্যে যাইয়া পৌছিতে পারে শুধু সেই সব অনুভূতি যাহা বাহ্য ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের সংস্পর্শে

আসিয়াছে, কিন্তু অজানা অপরিচিত অনুভূতি মগজের মধ্যে প্রবেশ করে কোন্ পথে ?

দূর দর্শন, দূর শ্রবণ প্রভৃতি ব্যাপার যত অসাধারণ—কেবল Psychical Societyর একচেটিয়া বিশেষত্ব বলিয়া মনে করি না কেন, বাস্তবিক তাহা নয়। এ সব জিনিষ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কমবেশী সকল মানুষেরই ইহা সাধারণ সম্পত্তি। এ সবের অস্তিত্ব আমরা খুঁজিয়া পাই না, কারণ এদিকে আমরা কোন নজর দেই না। নজর দিলে দেখিতাম নিজেদের অলক্ষ্যেই কত অনুভূতি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বার সব ডিঙ্গাইয়াই যেন আমাদের মধ্যে আসিতেছে। পূর্ব্বানুভূতি—Premonition—ব্যাপারটি সাধারণ জীবনে যত বিরল মনে করি তত বিরল নয়। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের যে জগৎ তাহার কতখানি শুধু বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের দেওয়া কাটাছাঁটা জ্ঞানের জগৎ ? বেশীর ভাগই তাহা অনুমানের, ধারণার (impression) জগৎ নয় ! মানুষ সম্বন্ধে, জিনিষ সম্বন্ধে, ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তাহা কতখানি তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর (Observation and Experiment) প্রতিষ্ঠিত ? স্থূল-ইন্দ্রিয়ের পরিচয় বেশীর ভাগই ভাসাভাসা একটু আধটু খণ্ড খণ্ড অসম্পূর্ণ নয় কি ? এ সব যেন আশ্রয় অবলম্বন ছুতা মাত্র। আসল যে বৃত্তি আমাদের জগৎ গড়িয়া দেয় তাহা যেন এসব ছাড়া আর একটা কিছু। সেটা কেবল কল্পনা নয়, তাহা হইলে জগতের কাজে আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতাম না, কেবলই

ভুলপথে চলিতাম। সেটি কল্পনারও পিছনে একটা কি সত্য-অনুভব।

আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা মগজের অণু-কোষের Radio-activityর কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই নূতন থিওরির মূল বক্তব্যটি এই, আমাদের প্রত্যেক চিন্তা প্রত্যেক ভাব মগজের মধ্যে একটা স্পন্দন তুলিয়া দেয়, আর সেই স্পন্দনে সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক ঢেউ সব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বে-তার টেলিগ্রাফের বৈদ্যুতিক ঢেউএর মত এই মগজে উৎপন্ন ঢেউসবও অনায়াসে আকাশের ভিতর দিয়া দূর দূরান্তরে চলিয়া যাইতে পারে ও বাস্তবিক পক্ষে চলিয়া যাইতেছে। শুধু তাই নয়, মগজ আবার দূর দূরান্তর হইতে আগত এই সব তরঙ্গ নিজের ভিতর ধরিতে পারে অর্থাৎ মগজ কেবল Generating Station নয়, তাহা আবার Receiving Station. চিন্তার ভাবের জগতে এই রকমে একটা একটানা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র চারিদিকে বিস্তৃত। সুতরাং একজন মানুষের চিন্তা ভাব আর-একজন মানুষের মধ্যে অনায়াসে আসা-যাওয়া আনাগোনা করিতেছে। অনেক সময়ে যে চিন্তা বা ভাবকে আমার নিজের চিন্তা বা ভাব বলিয়া বোধ করি বাস্তবিক পক্ষে তাহা আর-এক-জনের—অন্যস্থান হইতে আগত চিন্তা বা ভাব মাত্র হইতে পারে। স্থূল বাহ্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তিতা ছাড়াও মগজে মগজে আছে একটা সাক্ষাৎ-সংযোগ, একটা অপরোক্ষ আদান প্রদান।

আমরা বলি, মগজে মগজে এই যে বৈদ্যুতিক প্রবাহের

বিনিময়, তাহাও কার্য্যমাত্র, আসল কারণ নয়। এটি হইতেছে আরও একটি সূক্ষ্মতর বৃহত্তর শক্তির বাহন। জড় আকাশ বা ঈথার নয়, কিন্তু আরও একটা সূক্ষ্মতর আকাশ সমস্ত সৃষ্টিকে এক করিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। আমরা তুরীয় চিন্ময় আকাশের কথা বলিতেছি না—সেটি বহু দূরের জিনিষ ; আমরা বলিতেছি, পাশ্চাত্যের জড় বা বৈদ্যুতিক শক্তিরই ঠিক উপরে আছে যে প্রাণশক্তির চিদাকাশ, তাহার কথা। তুরীয় চিন্ময় আকাশের উপলব্ধি আসে পূর্ণজ্ঞানের সাধনার ফলে, কিন্তু প্রাণশক্তির চিদাকাশের অনুভূতি ন্যূনাধিক নিত্যনৈমিত্তিক জিনিষ, তাহা মানুষের সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতির পিছনে সর্ব্বদাই জাগ্রত রহিয়াছে। তুরীয় আকাশ মানুষের চেতনার ওপারের কথা। এক দিকে এই আধ্যাত্মিক চেতনার আকাশ আর এক দিকে পাশ্চাত্যের বিদ্যুন্ময় আধিভৌতিক আকাশ—এই দুইএর মাঝখানে, উভয়কে সংযুক্ত করিয়া, উভয়ের মধ্যে একটা রাস্তা করিয়া ধরিয়াছে ঐ প্রাণময় চেতনার আধিদৈবিক আকাশ। ইন্দ্রিয়ের যে নিগূঢ় শক্তি, যে অধিপতি তাহারই নাম বৈদিক ভাষায় দেবতা নয় কি ?

স্থূল ইন্দ্রিয় জিনিষের যে অংশের বা স্তরের (বা কোষের) সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয় তাহা হইতেছে বড় কাঠামটি, এ যেন জিনিষের ফটোগ্রাফ অর্থাৎ শুধু বাহিরের চেহারার রেখা বিন্যাস, এখানে পাই না জিনিষের প্রাণের গতি। যখনই যে বস্তু আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে তখন

যে আমরা কেবল তাহার বাহ্য রূপটিরই জ্ঞান পাই তাহা নহে, তাহার সহিত সেই মুহূর্ত্তেই হইয়া যায় একটা কি অন্তরঙ্গ পরিচয়, একটা রসের সম্বন্ধ—সেটি ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির বাহিরের জিনিষ। যখন একটা গাছ বা পশু বা পাখী বা অতি সামান্যও একটা যা-কিছু আমাদের নজরে পড়িয়া যায় তখন যে আমরা তাহার শুধু শরীরের গঠনটা দেখি তাহা নয়, তাহার প্রাণের তরঙ্গের সাথে আমাদের প্রাণের তরঙ্গ সমান তালে দুলিয়া ওঠে অথবা একটা কিছু অদৃশ্য নিবিড় আদান-প্রদান ঘটিয়া যায়। আর সেই জন্যে জিনিষের চেহারা যত আমাদের মনে থাকুক আর না থাকুক, কোথাও থাকিয়া যায় তাহার একটা কেমন অস্পষ্ট ভাব, একটা ধারণার ছাপ, আর এক রকমের একটা নামরূপ। অনেক সময়ে আমরা দেখি না কি যে, পূর্ব্ব-দৃষ্ট কোন জিনিষকে যখন স্মৃতির মধ্যে আনিতে চাই তখন তাহার বাহিরের চেহারা আমাদের মনে ফুটি-ফুটি করিয়াও ফুটে না যেন, তাহা ফুটিয়া উঠিতে চায় কেবল কেমন একটা ভাব-শরীর লইয়া ?

বাস্তবিকপক্ষে জিনিষের আসল সত্তা হইতেছে এই ভাব-শরীর। স্থুলশরীর এই ভাবশরীরেরই জের বা ছায়া। ইউরোপীয় বিজ্ঞানও আজকাল এই ধরণের একটা কথা বলিতেছে। জড় পদার্থ যাহাকে বলি তাহা নিতান্তই জড় নহে, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব এটি হইতেছে একটা বৈদ্যুতিক শক্তির সমবায় (Radiant matter), স্থুলভূত হইতেছে

এই তেজোময় পদার্থের একটা পরিণতি একটা কঠিনীকৃত রূপ। তবে ইউরোপীয় বিজ্ঞান এই Radiant matterএর সহিত চেতনার সম্বন্ধটা এখনও ঠিক ধরিতে পারিতেছে না। তবে এটি যে অচেতন নয়, ইহার মধ্যেও আছে একটা চেতনার ভাব তাহার আভাস কেহ কেহ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বের্গসঁ এই জিনিষটিরই নাম দিতে চাহিতেছেন Mind-Energy, কিন্তু Radiant matter হউক আর Mind-Energy হউক, ইহারা আরও একটি সূক্ষ্ম শক্তির প্রকাশ, এই জিনিষটির আর একটি বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, এখানে পাই মুক্ত চলাচলের ধারা। স্থূল ভৌতিক পদার্থ সব যেন আলাদা আলাদা, প্রত্যেকেই একটা কঠিন খোলসের মধ্যে আপনাকে সরাইয়া ঢাকিয়া রহিয়াছে—তাহাদের পরস্পরের আদান প্রদান হয় যেন নেহাৎ পরোক্ষে, একটা স্বাভাবিক বাধাকে অতিক্রম করিয়া। কিন্তু বস্তুর যে তেজোময় সচেতন সত্তা তাহা যেন সব একই আধারের মধ্যে ঢালা, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অনায়াসে চলিয়া ফিরিয়া যাইতেছে, এ যেন একই জলধারার বক্ষে নানা ঢেউয়ের সলিলক্রীড়া।

এই স্তরে যখন আমরা দাঁড়াই, তখন জিনিষের সহিত পরিচয় আমাদের হয় একটা সহজ সাক্ষাৎ প্রাণ-স্রোতের মিলনের ফলে। আগেই যেন পাই জিনিষের একটা সূক্ষ্ম স্পর্শ (অর্থাৎ সব ইন্দ্রিয় যেখানে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে সেখানকার একটা অনুভূতি), তারপরে তাহার একটা বিশিষ্টরূপ

পাই বিশেষ ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের সহায়ে। কালিদাস বলিয়াছেন "সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বং"—সম্বন্ধের আগে হইয়াছে আভাষণ, কিন্তু এখানে দেখি তাহার বিপরীত, আগে হয় একটা সম্বন্ধ, তার পরে আভাষণ। এখানে দেশের ও কালের ব্যবধান যেন নাই—সবই চলিতেছে একই বর্ত্তমানে।

এই সূক্ষ্ম জগতেরই মধ্যে আমরা প্রতিনিয়ত বাস করিতেছি। আমাদের সূক্ষ্ম-অনুভূতি দিয়াই প্রকৃতপক্ষে স্থূলজগতের পরিচয় লইতেছি। আমাদের স্থূল-ইন্দ্রিয়-অনুভূতি এই সূক্ষ্ম-অনুভূতির উপরই দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে প্রয়োজন মত কাটিয়া বাঁটিয়া ধরিতেছে। তবে এই সূক্ষ্মের সাথে আমাদের সহজ সম্বন্ধটি তেমন সজাগ ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই যে, কর্ম্মের তাড়নায় আমরা ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখী গতিস্রোতে গা ঢালিয়া দেই, এইটিকেই বড় করিয়া দেখি, ইহার পিছনে যে সত্য ও শক্তি আছে তাহাকে তেমন নজরে আনিবার চেষ্টা করি না। বিশেষতঃ আজ-কালকার যুগে আমরা বেশী রকম স্থূলদৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছি, শুধু কর্ম্ম সাফল্যকেই উদ্দেশ্য করিয়া ধরিয়াছি বলিয়া নয়, কিন্তু বুদ্ধি বা তর্কবৃত্তির উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করিতে শিখিয়াছি বলিয়া। ফলতঃ আমরা যে সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা বলিতেছি তাহার প্রধান পরিপন্থী হইতেছে তর্কবৃত্তি। তর্কবৃত্তি সাধারণতঃ প্রাণের স্পর্শালুতাকে, অনুভবকে, রসবোধকে ফুটিয়া উঠিতে দেয় না। তর্কবৃত্তি স্থূল-ইন্দ্রিয়ের স্থূল-জ্ঞানের জড় উপকরণ

কেবল সংগ্রহ করিয়া দেয় এবং তাহার মধ্যে একটা কৃত্রিম সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। জিনিষে যে সহজ প্রাণের সম্বন্ধ তাহার খোঁজ শুষ্ক বিচারে পাওয়া যায় না, তাহা কেবল অনুভবগম্যই। এই অনুভব অবশ্য নানা ধরণের নানা স্তরের হইতে পারে—ইহার মধ্যে কল্পনার, ব্যক্তিগত বাসনার রঙ ধরিয়া যাইতে পারে কিন্তু এই ভুলের সম্ভাবনা থাকিলেও এখানেই আছে প্রকৃত সত্যেরও সম্ভাবনা।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাদীক্ষার গোড়ার অভাব ঠিক এইখানে। এই শিক্ষাদীক্ষা আমাদের মস্তিষ্ককে শানাইয়া তুলিতে চায় কিন্তু প্রাণের স্পর্শালুতা যে কি জিনিষ তাহার খোঁজ রাখে না। স্থূল-ইন্দ্রিয়ের যথাযথ প্রয়োগ অভ্যাস করা হইতেছে আধুনিকতম শিক্ষার নূতন আবিষ্কার, ইহার উদ্দেশ্য শুধু তর্কগত যে বুদ্ধি তাহাকে শোধরান, তাহাকে বাস্তবের সাথে সংযুক্ত করিয়া রাখা। কিন্তু ফলে ইহাতেও আমরা মস্তিষ্কের কাঠামটিকেই আরও নিরেটই করিয়া তুলি। ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের আগে আমাদের আবিষ্কার করা দরকার ইন্দ্রিয়ের মূল শক্তি, স্থূল অনুভূতিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতেছে যে সূক্ষ্ম অনুভূতি তাহার উদ্বোধনই সকল শিক্ষাদীক্ষার প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষার স্থলে আমরা কেবল বাহিরের facts খুঁজিয়া মরি, তাহাদিগকে হুবহু তালিকা-সই করিয়া ফেলিতে চাই—কিন্তু সে-সব হইতে যখন সাধারণ নিয়ম কিছু নিষ্কাষণ করিতে চাই তখনই পড়িয়া যাই বিষম গোলমালে, তখন যেন সত্যকে আর হাতড়াইয়া খুঁজিয়া

পাই না। এ সহজ কথাটা আমরা ভুলিয়া যাই যে নিছক facts কখন জোগাড় হয় না, যে জোগাড় করে তাহার মনের ধাত যে রকম সেই রকম factsই তাহার নজরে পড়ে বা সেই রকম রঙেই আগে হইতেই সে সব রঙিয়া উঠে। সুতরাং দরকার এই ভিতরের ধাতটিকে সজাগ করিয়া, শুদ্ধ করিয়া ধরা। আমাদের এই যুগ যে কেবল সংগ্রহকারী—scholars, archeologistsদের যুগ, এখন যে রসজ্ঞের এমন অভাব, অভিধান যে কত রকম গড়া হইতেছে কিন্তু সেই অনুপাতে কাব্য যে গড়িয়া উঠিতেছে না তাহার কারণও এইখানে।

আমরা গোড়ায় বলিয়াছি মানুষ মনের সহায়ে জ্ঞান পায় না। মন হইতেছে সেই বৃত্তি যাহা স্থূল-ইন্দ্রিয়-অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, উহা এই স্থূল-ইন্দ্রিয়-অনুভূতিরাজীকেই সাজাইয়া গুছাইয়া ধরিতেছে। মনের ছাঁচ ঢালা এই স্থূল-ইন্দ্রিয়ের ধাঁচে। মনই যদি কেবল আমাদের জ্ঞান দিত, জগতের পরিচয় দিত তবে স্থূল-ইন্দ্রিয়ের বাহিরের বস্তু আমরা মোটেও চিনিতে পারিতাম না। মানুষের মনের কথা বুঝিতে পারিতাম না, দেখিতাম কেবল তাহার বাহিরের কতকগুলি অঙ্গচেষ্টা। জিনিষের ঘটনার অর্থ ধরিতে পারিতাম না, কেবল পাইতাম কতকগুলি বাহিরের ইঙ্গিত, চিহ্ন বা সঙ্কেত। আমাদিগকে চলিতে হইবে কেবলি অনুমানের উপর। আকারের সহিত আমাদের পরিচয় হইত, কিন্তু প্রকার সম্বন্ধে আমরা একেবারে

অন্ধ হইতাম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা ত নয়। বস্তুর কেবল বাহিরকেই আমরা দেখি না, বুঝি না, একটা সূক্ষ্ম সংযোগ আমাদিগকে বস্তুর অন্তরের সহিতই সর্ব্বদা সংযুক্ত করিয়া দিতেছে না কি? তাই ত মানুষের সহিত হউক বস্তুর সহিত হউক ঘটনার সহিত হউক, পরিচয়ের জন্য আমরা কেবল ইন্দ্রিয়ের উপরই নির্ভর করি না—তাহা হইলে সে পরিচয়ের আর শেষ হইত না। ইন্দ্রিয়ের দুই একটা স্পর্শের ফলেই আমরা যেন পাই সমস্ত মানুষটির বস্তুটির ঘটনাটির সমগ্র পরিচয়। সে পরিচয় সব সময়ে সঠিক না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার পিছনে যে একটা সত্য নাই এমন নয়।

ফলতঃ, এই রকম পরিচয় যে জ্বলন্ত সত্যসন্ধ হইয়া উঠিতে পারে না, তাহার কারণ আমাদের বিকৃত স্বভাব—বিশেষতঃ আজকালকার জড় বৈজ্ঞানিক যুগে। সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয়কে আমরা সন্দেহেরই চোখে দেখি, তাহাকে শুদ্ধ সজাগ করিয়া ধরিতে চাই না। যখনই সন্দেহ উপস্থিত হয় তখনই, সত্যের কষ্টিপাথররূপে আমরা স্থূল-ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় গ্রহণ করি—এই স্থূলের কাঠামেই আমরা ঢালিতে চাই সেই সূক্ষ্মকে। তাই সূক্ষ্মের আপন স্বরূপ ফুটিয়া উঠিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-আরূঢ় মনের প্রধান অভিব্যক্তি হইতেছে তর্কবুদ্ধি। জড়বিজ্ঞান এই তর্কবুদ্ধিকেই গবেষণার একমাত্র যন্ত্র করিয়া লইয়াছে। সিদ্ধান্তের জন্য আমরা চাহি facts, আরও facts. গাছের প্রাণ আছে কি না, চেতন আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য আমরা কত

রকম কল বানাইতেছি। কিন্তু তাহাতে পাই কি? আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রাণের চেতনার যে সব বাহিরের চিহ্ন তাহাদের সহিত মিলাইয়া দেখি মাত্র। পশুর বিচারবুদ্ধি আছে কি না তাহা মীমাংসা করিবার জন্য তুলনা করি মানুষের মধ্যে ও পশুর মধ্যে ফলের সাদৃশ্য বা তারতম্য দিয়া। তাই ত অনেক সময়ে অনেক মনীষীকে বলিতে দেখি, ফলের সাদৃশ্য থাকিলেও পশু হইতেছে জড় যন্ত্র মাত্র (automaton). তাই ত জগতে একটা উদ্দেশ্যমূলক রচনাচাতুর্য্য দেখিয়াও আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, ইহার পিছনে আছে একটা বিরাট পুরুষের চেতনা।

উদ্ভিদেরও আছে সুখ-দুঃখ, পশুপক্ষীরও আছে জ্ঞান-বুদ্ধি, জগতের কর্ত্তা আছে এক ভগবান—এই যে সব তথাকথিত প্রাকৃতজনের অনুভূতি, তাহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় (সাধারণ লোকে অন্ততঃ সে সব বিজ্ঞানের তত্ত্ব জানে না), কিন্তু তাই বলিয়া সে সব যে কেবল কল্পনা তাহা জোর করিয়া কেহ বলিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকের রাস্তা দিয়া এসব অনুভূতি আসে নাই, এসব অনুভূতি আসিয়াছে আর একটা সূক্ষ্ম রাস্তা দিয়া, তাই এসব অনুভূতি যুগে যুগে দেশে দেশে এমন প্রচলিত সর্ব্ব-সাধারণ। কিন্তু এগুলিও গেল অতি মোটামুটি সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা। তর্কবুদ্ধির বিপুল আক্রমণে আরও সব কত নষ্ট হইয়া গিয়াছে যাইতেছে, আরও কত আদৌ ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে যে তীক্ষ্ণ তর্কবুদ্ধি-ওয়ালা মনীষী লোক তেমন দেখিতে পাই না, দেখিতে পাই যে উল্টা ধরণের লোক, অতি সাধারণ স্তরের মানুষ, তাহার কারণও এইখানে। তর্কবুদ্ধি মানুষের সতেজ অনুভূতিকে শুকাইয়া নষ্ট করিয়া দেয়। সহজ মানুষের মধ্যেই সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষেত্র সরস থাকিবার বেশী সম্ভাবনা। এই সূক্ষ্মের সাক্ষাৎ প্রকাশ ছাড়া ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতা থাকিতে পারে না। স্থূল-ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর যেমন বৈজ্ঞানিকের তর্কবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত, সেই রকম সূক্ষ্ম-অনুভূতির উপরই প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের সত্য। তাই বৈজ্ঞানিকের প্রণালী দিয়া কোন দিনই অধ্যাত্ম-রাজ্যে পৌছান যায় না। তবে ইন্দ্রিয়ানুভূতির, তর্কবুদ্ধির, জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা যে নাই তাহা নয়, সে সার্থকতা হইতেছে ভুল, সূক্ষ্ম-অনুভূতি ধরিয়া দেওয়া অর্থাৎ শুধু কল্পনার অনুভূতি যাহাতে যথার্থ সূক্ষ্মানুভূতি বলিয়া না চলিয়া যায় তাহার প্রতিষেধ করা। স্থূল-অনুভূতির কার্য্য হইতেছে অভাবাত্মক (negative), ভুল দেখাইয়া দেওয়া (corrective), কিন্তু এ কার্য্যটিও হয় একটা বিশেষ গণ্ডীর ভিতরে। আসল ভুল ধরা, ভুলকে এড়াইয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা তাহাও সূক্ষ্মানুভূতি-সাপেক্ষ।

সে যাহা হউক, সূক্ষ্মানুভূতিরও আছে আবার নানা স্তর। সকলের নীচে হইতেছে প্রাণময় সত্তার সহজ অনুভূতি যাহাকে বলা হয় Instinct—এই অনুভূতির মধ্যে উপরের একটা

চেতনার আলো যখন পড়িতে থাকে, তখনই তাহা যথার্থ সূক্ষ্ম হইয়া উঠে, তাহাতে চিত্র বিচিত্র জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। তখন কেবল জিনিষের রূপ দেখি না তখন পাই জিনিষের স্বরূপ, তখন তাহার দেহের গঠন কেবল বিশ্লেষণ করি না, তখন পাই অন্তরাত্মার শক্তির লীলাভঙ্গী, সাধারণ জীবনে এই সূক্ষ্মস্পর্শালুতা মিশিয়া থাকে এক তর্কবুদ্ধির সাথে আর স্থূল-ইন্দ্রিয়গত কর্ম্মচেষ্টাগত অনুভূতির সাথে। এই শেষোক্ত জিনিষগুলিরই উপর আমরা বেশী জোর দেই বলিয়া উহাদের আসল শক্তি উৎস যেখানে তাহা ধরিতে পাই না। কবিদের মধ্যে এই জিনিষটির কিছু আভাষ পাই কিন্তু তবুও তাহাকে কল্পনা বলিয়া, সুন্দর খুব বড় কল্পনা বলিয়া আমরা উড়াইয়া দেই, কবিরা নিজেরাও বোধ হয় তাহাই করেন। এক মিস্‌-টিকদের মধ্যে দেখি এই জিনিষটিকে জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা চলিয়াছে, তবে সেখানেও সত্য মিথ্যার খুব কড়া যাচাই করিবার প্রয়াস হয় নাই।

আজকাল জড় জগতের গোড়ার ভিত খুঁড়িতে খুঁড়িতে আমরা যেন বাধ্য হইয়াই এই সূক্ষ্ম সত্যটির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। কিন্তু কেবল জড়কে আঁকড়িয়া ধরিয়া চলিলে ও-বস্তুতে কোনদিনই পৌঁছিতে পারিব না। জড় হইতে সূক্ষ্মে উঠিতে হইলে চাই একটা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টি, আধারের একটা conversion—বৈজ্ঞানিকের নিরেট বহির্ম্মুখী পদ্ধতি নয়, চাই আধারের একটা প্রসন্ন শান্ত অন্তর্ম্মুখীনতা।

ইউরোপের Psychic Schoolএর এইটিই মস্ত ভুল, তাঁহারা সূক্ষ্মজগতের কার্য্যেও স্থূলজগতের পদ্ধতি আরোপ করিতে চাহিতেছেন। সূক্ষ্মজগৎকে সূক্ষ্মবৃত্তি দিয়া জানিতে হইবে সুতরাং চাই আগে এই সূক্ষ্মবৃত্তির উদ্বোধন। ভারতের এই জিনিষের জন্য যোগসাধনার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

এ যুগে তাই প্রয়োজন একদল নতুন রকম বৈজ্ঞানিক; তাঁহারা স্থূলজগতের কার্য্যাবলীর মানচিত্র কেবল আঁকিয়া দিবেন না, তাঁহারা আগে দিবেন আঁকিয়া সূক্ষ্মজগতের মানচিত্র, জিনিষের ভৌতিক ক্রিয়াকলাপকে তাঁহারা মুখ্য করিয়া ধরিবেন না, তাঁহারা খোঁজ লইবেন জিনিষের প্রাণের চেতনার ধারা। এই বস্তুটিকে আয়ত্ত করিলে বাহিরের ক্রিয়া-কলাপ সত্যতঃ বোধগম্য হইবে, একটা নূতন অভি-ব্যঞ্জনায় দেখা দিবে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

জ্ঞানের তপস্যা

আধ্যাত্মিক সত্যলাভের ধর্ম্মজীবন উদ্বোধনের একটা বৃহৎ অন্তরায় হইতেছে মানুষের তর্কবুদ্ধি। কারণ মানুষের তর্কবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত জড়জগতের সত্যের উপর, স্থূল ইন্দ্রিয়ের পরিচয়ের উপর; ঐহিকের চলন ও গড়নেই তর্কবুদ্ধির গোড়ার ভিত্তি, ঐহিকের সীমানাই তাই তর্কবুদ্ধির সীমানা দিয়া চলে। অধ্যাত্মের সত্য পাইতে হইলে চাই আর একটা বৃত্তির সহায়। তর্কবুদ্ধি যেমন জড়বস্তুকে বিনা সন্দেহে স্বীকার করিয়া লয়, সহজ প্রতীতির প্রমাণই যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করে; সেই রকম অধ্যাত্মের গোড়ার সত্যটিও মানিয়া লওয়া দরকার একটা সহজ স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার সহায়ে। গোড়ার কোন সত্যই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না—জ্যামিতিতে যে রকম, জীবনেও সেই রকম কতকগুলি axioms এবং postulates লইয়া আরম্ভ করিতে হয়, এইগুলির উপরই আর সকল জিনিষের প্রমাণ সাজাইয়া ধরা সম্ভব হয়। চক্ষু চাহিয়া দেখিলেই, যাহা দেখি আছে তাহার নাম দেই জড় জগৎ; সেই রকম আর একটা ভিতরের দৃষ্টি দিয়া দেখিলেই দেখি আছে অধ্যাত্ম জগৎ। অন্ধ যে সে জড় জগৎ দেখিতে পায় না, তাই বলিয়া জড় জগৎ যে নাই তাহা নয়; সেই রকম অন্তরের একটা দৃষ্টি যার নাই সে অধ্যাত্মকে দেখিতে পায়

না বলিয়া যে তাহা 'নাস্তি' এমনও নয়। অন্তরের দৃষ্টি ও বাহিরের দৃষ্টি, এই দুইটিই মানুষের সহজ স্বাভাবিক বৃত্তি। তবে ঘটনার চক্রে, অবস্থার বিপাকে, শিক্ষাদীক্ষার ফলে একটি দেখি আর একটির মত ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ ও সুবিধা পায় না; তাই বলিয়া সেটি যে কম সত্য তাহা নয়। কিন্তু দোষই ত এইখানে। সুযোগ ও সুবিধা পাইয়া তর্কবুদ্ধি dictator হইয়া পড়িয়াছে, নিজের সহযোগী বৃত্তিটিকে পায়ের তলায় ফেলিয়া পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছে। আত্মাকে ভগবানকে তাই তর্কবুদ্ধি খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে বলিতেছে কোথায় তোমার তুরীয় জগৎ, সৃষ্টির সব রহস্য আমি পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারি এই আমার স্থূল ইন্দ্রিয়ের শক্তির সহায়ে!

কিন্তু তর্কবুদ্ধি সৃষ্টির রহস্য সব ব্যাখ্যা করিতে পারুক আর না-ই পারুক, তাহাতে অধ্যাত্মের অসত্যতা কিছু প্রমাণ হয় না। তাই অধ্যাত্মের পূজারী স্পষ্ট স্বরে অকুণ্ঠিতভাবে বলিতেছেন—নৈষাতর্কেণ মতিরাপণীয়া। তাই দেখি ধর্ম্মবীর-দিগের কাছে তর্কবুদ্ধিকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে, এখানে আসিয়া তাহার রাজমুকুট ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে। তর্কবুদ্ধি সচরাচর ধর্ম্মজীবনের পরিপন্থী বলিয়া ধর্ম্মজীবনের সাধকেরা প্রায়ই ও-বৃত্তিটিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, এমন কি তাহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে, তাহার ছায়াটি পর্য্যন্ত না মাড়াইতে উপদেশ দিয়াছেন। যত প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-

সম্প্রদায় আছে, তাহার সবগুলিরই সৃষ্টির গোড়ায় একটা বড় কৌতূহল-উদ্দীপক ব্যাপার দেখিতে পাই। সমাজের যে নিম্নতম শ্রেণী অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে বিদ্যা বা বুদ্ধির তেমন প্রাবল্য কিছু নাই, ধর্ম্মস্রষ্টাগণ তাহাদেরই গোড়ায় আয়ত্তে আনিয়াছেন, তাহাদেরই লইয়া ধর্ম্মসঙ্ঘের বনিয়াদ স্থাপন করিয়াছেন। সমাজের যাহারা পতিত—কেবল চরিত্র হিসাবে নয়, জ্ঞানবুদ্ধির হিসাবেও—তাহাদেরই উদ্ধারের জন্য যেন মহাপুরুষেরা আসিয়াছেন আর তাহাদের লইয়াই কাজ করিতে পারিয়াছেন। খৃষ্টের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল বিশেষভাবে জেলেদের মধ্যে, দুঃস্থের পীড়াগ্রস্তের মধ্যে। মহম্মদের আহ্বানে নাচিয়া উঠিয়াছিল, প্রথমে আরব মরুভূমের দুর্ম্মদ দস্যুপ্রায় প্রাণ সব। বুদ্ধ যখন প্রচারে বাহির হইলেন তখন তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল দলে দলে সমাজের অধস্তন জীবেরা সকলে। ছোট ছোট সম্প্রদায় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা—সকলেই শিষ্যসামন্ত পাইয়াছেন জোগাড় করিয়াছেন সমাজের মাথা হইতে নয়, সমাজের পা হইতে।

এ রহস্যের ব্যাখ্যা কঠিন নয়—আমরা গোড়াতেই তাহা দিয়াছি। প্রথমতঃ, যাঁহারা সমাজে মাথা অর্থাৎ যাঁহারা সত্যকে মানিয়া লইবার পূর্ব্বে যাচাই বাছাই করেন, বিচার বিতর্ক করিয়া প্রমাণ খোঁজেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রায়ই পান না, কারণ তাঁহারা এমন একটা মাপকাঠি লইয়া আসেন যাহা এ ক্ষেত্রে ঠিক খাপ খায় না, ইহার সবটা

আসল জিনিষটা ধরিতে পায় না। তাঁহাদের বুদ্ধি এমন একটা নিরেট ছাঁচ পাইয়া বসিয়াছে, তাহা চলিতেছে ফিরিতেছে এমন একটা ধরা বাঁধা ধারায় যে, তাহার বাহিরের কোন জিনিষ নূতন কোন সত্য সেখানে প্রবেশ করিবার, আপনাকে প্রতিফলিত করিবার, অবকাশ পাইতেছে না। সমাজের যাহারা মাথা নয়, তাহাদের বুদ্ধি ও-রকম আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই, নরম মাটির মত সেখানে নতুন জিনিষের বীজ সহজেই স্থান করিয়া লইতে পারে, অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে পারে। তাহাদের মাথা শক্ত কঠোর হইতে পারে নাই, উহাকে যথা-ইচ্ছা ঢালাই করিয়া লওয়া খুবই সহজ। তর্ক-বুদ্ধি গতানুগতিককে এমন আঁকড়াইয়া ধরে—বিশেষতঃ গতানুগতিকের বাহ্য ঘটনা বা রূপের দিকটা যে তাহার সহিত হুবহু না মিলাইয়া লইতে পারিলে নতুন সত্যকে সে আমলই দিতে চায় না। তারপর দ্বিতীয়তঃ, মাথার চর্চ্চা যেখানে অত্যধিক পরিমার্ণে হইয়াছে সেখানে প্রাণশক্তির কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সামর্থ্য ততই যেন কমিয়া গিয়াছে। কাজেই বুদ্ধিমানদের লইয়া বৃহৎ কর্ম্ম কিছু করা সুকঠিন। বুদ্ধিমানেরা যতক্ষণ সত্য মিথ্যা লইয়া চুলচেরা বিশ্লেষণ করিতে থাকিবেন, কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় সে বিষয়ে গভীর গবেষণায় মত্ত, ততক্ষণ সহজ মানুষ একটা ঐকান্তিক শ্রদ্ধা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া যাইবে। সমাজের অধস্তন শ্রেণীর আর কিছু না থাকুক, আছে জীবনীশক্তি, আছে সচল প্রাণ,—

সত্যকে কোন রকমে একটু ধরিতে পাইলেই তাহার হইল, সে যেমন উহাকে সজীব মূর্ত্তিমান করিয়া ধরিবে, সহস্র তার্কিক তাহাদের পুঞ্জীভূত প্রমাণ লইয়াও তার শতাংশের একাংশও করিতে পারিবে না।

তাই ত যুগে যুগে দেখি তার্কিকদের সহিত নূতন ধর্ম্ম-স্রষ্টাদের দ্বন্দ্ব। Socratesকে যুদ্ধ করিয়া চলিতে হয় Sophists অর্থাৎ জ্ঞানী বা বুদ্ধিমানদের সহিত—সত্যকে যাহারা একটা সহজ উপলব্ধি একটা অপরোক্ষ অনুভূতি (Intuition) দিয়া পাইতে চাহে নাই, যাহাদের অন্তরাত্মায় স্পর্শ করে নাই একটা অতীন্দ্রিয়ের আবেশ (Daemon), যাহাদের প্রমাণ হইতেছে ন্যায়শাস্ত্র, কথার কাঠাম। Socratesএর শিষ্য সব হইয়াছিল তাই এথেন্সের ছেলে ছোকরার দল, যুবক-সম্প্রদায়—যাদের মস্তিষ্ক দানা বাঁধে নাই, যাদের প্রাণ তরুণ সবুজ সজীব। খৃষ্টকেও দেখি যুদ্ধ করিতে Scribes এবং Pharisees-দের সাথে—তাঁহার মুখে শুনিতে পাই, তিনি স্পষ্ট শাসাইয়া বলিতেছেন—The wise will be confounded in their wisdom. সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই দেখি এই রকম—মহাপুরুষদের আবির্ভাব জ্ঞানীদের বুদ্ধিমানদের জন্য নয়, কেবল যেন মূকদিগকেই বাচাল করাইবার জন্য, পঙ্গুদিগকেই দিয়া গিরি উল্লঙ্ঘন করাইবার জন্য।

এই ভাবে কাজটি সহজ হইয়াছে বোধ হয় অনেকখানি, কিন্তু ইহার আনুষঙ্গিক কুফলও কিছু হয় নাই তাহা বলা যায়

না। অধ্যাত্মের ধর্ম্মের জীবন সচরাচর আঁকড়িয়া ধরিয়াছে তাহারাই যাহাদের মধ্যে প্রবল ভাবের আবেশ, প্রাণের আবেগ, চিত্তের উত্তেজনা—সমাজের এমন স্তরের এমন শ্রেণীর লোক যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি তেমন সতেজ প্রখর নয় বা হইয়া উঠিতে পারে নাই, যাহাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়াছে একটা তীব্র অশুদ্ধ রজঃশক্তি কিম্বা একটা ঘোর তমঃপ্রভাব। সুতরাং দেখি এই প্রাণের চিত্তের খেলাকে যত লোক শুদ্ধ পরিবর্ত্তিত করিয়া অধ্যাত্মের মধ্যে উঠাইয়া ধরিতে পরিয়াছে, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী লোকই সেই অধ্যাত্মকে নামাইয়া ফেলিয়া প্রাণের চিত্তের খেলার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে। স্থাপয়িতার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই যে ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি কি রকম পচিতে গলিতে আরম্ভ করে, তাহার নিদর্শন হাত বাড়াইলেই যথেষ্ট পাই, বেশী দূর অগ্রসর হইতে হয় না। বুদ্ধির ক্ষেত্রে মানুষের এমন আকস্মিক এত ভীষণ অধোগতি হয় না, যতখানি হয় অধ্যাত্মের ধর্ম্মের ক্ষেত্রে। এটা সত্যকথা শুষ্ক তর্কবৃত্তি ধর্ম্মবোধের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির অন্তরায়; কিন্তু তাই বলিয়া এ সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে না যে তর্কবৃত্তি না থাকাটাই হইতেছে অধ্যাত্ম-সত্য লাভের সেরা উপায়। তর্কবৃত্তি অন্তরায় হইতে পারে কিন্তু প্রাণের আবেগ চিত্তের উত্তেজনাও অন্তরায়—কোন্‌টা কিছু বেশী, কোন্‌টা কিছু কম অন্তরায় তাহা নির্ণয় করা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

আসল কথা এই অধ্যাত্মজীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য চাই যেমন সরল স্পর্শালু চিত্ত আর সজীব প্রাণ, সেই রকম চাই একটা সজাগ বুদ্ধি, বিচারশক্তি। তবে চিত্তকে, প্রাণকে যেমন শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়, সেইরকম বুদ্ধিকেও শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়—অন্তরায় বলিয়া ওটি যেমন বাদ দিয়া রাখা যায় না, তেমনি এটিকেও নাকচ করা চলে না। বরং এ কথাও বলিতে পারা যায়, চিত্তের প্রাণের শুদ্ধি সিদ্ধ হয় বুদ্ধির বিচার-শক্তির সহায়ে; শুধু তাই নয়, অধ্যাত্মের সত্য নির্ম্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে একটা স্থির ধীর অটুট বুদ্ধিকেই ভর করিয়া। গীতায় তাই 'স্থিত প্রজ্ঞার' উপর এতখানি জোর দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য, এই 'স্থিত প্রজ্ঞা' আর তর্কবুদ্ধি এক জিনিষ নয়—কিন্তু জ্ঞানের সবখানি না হউক, একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান হইতেছে বিচার ও বিতর্ক। বিচার বিতর্কের উপরে উঠিতে চাও, ভাল কথা; কিন্তু বিচার বিতর্ক কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলা, তাহাকে কেবলই সন্দেহ বা ভীতির ভাবে দেখাটাই যে উপরে উঠার উপায় বা চিহ্ন তাহা নয়।

অধ্যাত্ম সাধকদের ধাতে একটা বড় কৌতূহলের ব্যাপার প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্মের আস্বাদ প্রথমে আসে একটা অতর্কিত অনুভূতির ভিতর দিয়া—একটা জ্যোতি, একটা শ্রদ্ধা, একটা আনন্দ প্রাণে চিত্তে ঢেউ খেলিয়া যায় এবং তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া, তাহার উপরই ভর করিয়া সাধক

সাধন পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। সে জিনিষটিকে কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি বিচারের মাপকাঠি ধরিতে পারে না, সাধারণ তর্কবুদ্ধি তাঁহাকে সে জিনিষটির উপর অশ্রদ্ধাই আনিয়া দেয়। সুতরাং ভাবের আবেশে যাহাকে পাইয়াছি তাহাকে ভাবের আবেশ দিয়াই ঘিরিয়া রাখিতে চাই, আধ্যাত্মিক রসের যে আনন্দ পাইয়াছি বিচার বিতর্কের খর কিরণে তাহাকে শুকাইয়া ফেলিতে চাই না। এইজন্যই কি নিমাই পণ্ডিত তাঁহার সকল পাণ্ডিত্যে জলাঞ্জলি দিয়া রস-মাতোয়ারা হইয়া পড়িয়াছিলেন? শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, তাঁহার মত শক্তিমান যাঁহারা নহেন, যাঁহাদের সামর্থ্যের ভাণ্ডার অতি কম, তাঁহাদের অবস্থা যে কি হয় তাহা আমরা জানি। একেবারে যাঁহারা ভাবে ঢল ঢল হইয়া কাঁদাইয়া ভাসাইয়া না-ও দেন, তাঁহাদের দেখিতে পাই এই যে একটা কিছু আনন্দের অনুভূতি পাইয়াই সেখানে থামিয়া গিয়াছেন, সেইটিকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া লইয়াছেন, তাহার মধ্যেই মস্‌গুল হইয়া আছেন। আর ভাবাবেগের সাথে যাহাদের আছে কর্ম্মের প্রেরণা তাঁহারা সেইটিকেই চরম সত্য ভাবিয়া বাহ্য জগতে জীবনে তাহাকে তাড়াতাড়ি ফলাইয়া ফুটাইয়া ধরিতে চাহিয়াছেন, তাহারই ছাঁচে সমাজকে বাঁধিয়া তুলিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে আধ্যাত্মিক জগতেও সত্য আছে, সত্যাভাস আছে, এমন কি মিথ্যা পর্য্যন্ত আছে। বাহ্য ইন্দ্রিয় যেমন আমাদিগকে ঠকায়, অন্তরিন্দ্রিয়ও আমা-

দিগকে তেমনি ঠকায়। স্থূল চক্ষু যেমন ভুল দেখায় যে সূর্য্য ঘুরিতেছে পৃথিবী স্থির হইয়া আছে, সেই রকম আধ্যাত্মিক অনুভূতিও ভুল অনুভূতি লইয়া আসে তাহা যত স্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বোধ হউক না কেন। এইখানেই দরকার হয় যাচাই বাছাই, বিচার বিতর্কের, বুদ্ধির প্রয়োগ। অটুট সত্যানুসন্ধিৎসার যে অটল তপস্যা, যে সজাগ ঋজুতা সে জিনিষটি যাঁহারা ধর্ম্মজীবন লইয়া পড়েন তাঁহাদের মধ্যে খুবই কম দেখিতে পাই। বাহ্য জীবনে যাঁহারা কেবল ভোগের পূজারী, তাঁহাদের মতনই হইতেছেন অধ্যাত্মজীবনে যাহারা কেবল আনন্দের পূজারী। অধ্যাত্ম আনন্দ-ঘন বস্তু সন্দেহ নাই; কিন্তু এই আনন্দে তাহারই অধিকার যে মাথা ঠিক রাখিয়া স্থির দৃষ্টিতে ইহাকে চিনিয়া চিনিয়া লইতেছে, বুদ্ধির পাষাণে কসিয়া কসিয়া যে অনুভূতিকে সত্য হইতে সত্যতর করিয়া লইতেছে। আনন্দ-উপভোগ বা কর্ম্ম-সৃজনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যানুরাগ যদি না থাকে, না থাকে যদি ধীর মস্তিষ্কের একটা পিছন-টান তবে সে আনন্দের সে কর্ম্মের স্রোতে আসিয়া পড়ে আধ্যাত্মিক বস্তুর সাথে অনেকখানি প্রাকৃত চিত্তবৃত্তির অশুদ্ধ শক্তির পঙ্ক ও মালিন্য। একটি ছোট্ট আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহিত জড়াইয়া উঠে আমাদের সহজ জীবনের বিপুল কল্পনা, রঙীন আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সচরাচর যে পরিণাম হইয়া পড়ে, তাহা ত এই জন্যেই।

শিক্ষা ও দীক্ষা

আধ্যাত্মিক লোকে সত্য আছে, সত্যের পর সত্য, তারপর আবার সত্য আছে—নীচের স্তরের সত্যে যে ভুলিয়া যায় না, যে চায় আরও সত্য আরও সত্য, সে-ই তত উপরে উঠিয়াছে সে-ই তত সত্যের স্বরূপে পৌঁছিয়াছে, তাহার চিত্তের প্রাণের কর্ম্ম-জীবনের বনিয়াদ তত সত্য ও সুদৃঢ় হইয়াছে। নতুবা আধ্যাত্মিক জগতের ছোট সত্য জড় জগতের বড় সত্যের কাছে অল্পেই হটিয়া যায়। ফলতঃ, আসল খাঁটি সত্য আছে শুধু দুইটি—এক নিছক জড়ের সত্য, আর নিছক অধ্যাত্মের সত্য ; আধ্যাত্মিক সাধনা বা ধর্ম্মজীবন লইয়া যাঁহারা সচরাচর নাড়াচাড়া করেন তাঁহারা এই দুইটির কোনটিই পান না, তাঁহাদের চেষ্টা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী, ইহার একটু আর উহার একটু সত্য লইয়া খেলা—কিন্তু এ রকম গোঁজামিলে উভয় কুলই হয় নষ্ট। বুদ্ধিকে সজাগ প্রহরী রূপে রাখিয়া, জ্ঞানের অস্ত্র লইয়া সত্যকে ভেদ করিতে করিতে যে চলিবে, পৌঁছিতে পারিবে চরম আধ্যাত্মিক সত্যে, তাহারই পূর্ণ অধিকার হইবে চরম জড় সত্যের উপর। নতুবা বুদ্ধিকে হারাইয়া, সত্য মিথ্যার নির্ব্বাচন-শক্তি লোপ করিয়া মাঝপথে যে দাঁড়াইয়া পড়িবে তাহার সৃষ্টি যতই বিপুল হউক না কেন, হইবে ক্ষণভঙ্গুর।

তর্কবুদ্ধির দোষ আছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনায় মানুষের আর আর বৃত্তিগুলিকে যেমন শুদ্ধ রূপান্তরিত করিয়া চলিতে হয়, সেই রকম তর্কবুদ্ধিকেও শুদ্ধ রূপান্তরিত করিয়া সঙ্গে লইতে হয়। রামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন "সাধু হবি, তাই ব'লে

বোকা হবি কেন"—বাস্তবিক সাধারণ সাধুদের কাণ্ডজ্ঞানের খুবই অভাব। বাহিরের বিষয়ে যাহার নাই এই কাণ্ডজ্ঞান (Sense of reality) অন্তরের বিষয়েও যে তাহার সে-জ্ঞান থাকিবে না, ইহা নিশ্চয়। তর্কবুদ্ধি আর কিছু না করুক এই কাণ্ডজ্ঞানকে জিয়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, আধ্যাত্মিক রোমান্সকে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া চলিতে দেয় না, টানিয়া সম্ভাব্যের মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করে। অবশ্য যে তর্কবুদ্ধি শুধু কথা লইয়া খেলা করে, বস্তুকে ছাড়িয়া বস্তুর নাম লইয়া টানাটানি করে, সে তর্কবুদ্ধিও কাণ্ডজ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া পড়ে, কিন্তু সে তর্কবুদ্ধি হইতেছে বুদ্ধির বিকার বা অপভ্রংশ, সেটির মধ্যেও মিশিয়া আছে রোমান্স সৃষ্টি করিবার একটা প্রেরণা, তাহাও কল্পনাবৃত্তির রকমফের, কাজেই সেটিকেও সংযত করিতে হয়, সত্য-নিষ্ঠার সহিত তাহাকে জুড়িয়া দিতে হয়।

আধ্যাত্মিক 'ভাবের' সাধনা বস্তুকে আনিয়া দিতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাধনা সেই বস্তুকে আবর্জ্জনা হইতে পরিষ্কার করিয়া স্বরূপে প্রকাশিত করে, নূতন বস্তুলাভের পথটা খুলিয়া রাখে। সিদ্ধ যাঁহারা, যাঁহারা কোন আধ্যাত্মিক সত্যের আবিষ্কারক বা ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহাদের মধ্যে এই ভাবের ও জ্ঞানের একটা সামঞ্জস্য বোধ হয় হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা যাহারা পরে আসি, শিষ্য প্রশিষ্য হই, আমরা লই কেবল ভাবের দিকটা, আমাদের চেষ্টা হয় পরের উপলব্ধ একটা গোটা জিনিষকে আত্মসাৎ করিয়া লওয়া—এ কথাটা

শিক্ষা ও দীক্ষা

আমরা ভুলিয়া যাই যে, যে-উপলব্ধিকে পদে পদে পরীক্ষা না করিয়া, আমাদের জ্ঞানের বুদ্ধির আলোকে পরিমার্জ্জিত না করিয়া ধরিয়া বসি, সে-উপলব্ধি শীঘ্রই মলিন হইয়া যায়, তাহার জোর কমিয়া যায়; একটা অন্ধ আবেগের বস্তু (passion) হইয়া তাহা ক্রমে আমাদের তামসিক প্রকৃতির মধ্যে ডুবিয়া লোপ পাইয়া যায়।

ফাল্গুন, ১৩২৮

কয়েকখানা ভাল বই

ভারতের নবজন্ম

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ প্রণীত

দাম পাঁচ সিকা

অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ভারতের অতীত শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা ও অধ্যাত্ম সাধনার নবরূপান্তরে বিকাশের বহুমুখী বিচিত্র ভঙ্গী, মনীষী অরবিন্দের সুনির্ম্মল মানসদর্পণে যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ। (আনন্দবাজার)। পুস্তকের কাগজ, ছাপা চমৎকার। পুস্তকের সৌষ্ঠবের জন্য প্রকাশক ও প্রেস উভয়েই ধন্যবাদার্হ। (স্বরাজ)।

ছাপা ও বাঁধা বড় সুন্দর, চিত্তাকর্ষক (প্রবর্ত্তক)।

প্রবর্ত্তক—নলিনীবাবুর লেখায় মৌলিক ও অনুবাদ ভেদ করা যায় না। বইখানি বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী সম্পদ স্বরূপ হইয়াছে। আমরা লেখক ও প্রকাশক উভয়কেই বঙ্গ-সাহিত্যের দিক দিয়া এই পুস্তক প্রকাশের জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

স্বরাজ—ভাবুক—সাধক—চিন্তাশীল অরবিন্দের লেখা নলিনী বাবু বঙ্গানুবাদ করিয়া বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভারতের কথা যাঁহারা ভাবেন, "ভারতের নবজন্মের" সহিত তাঁহাদের পরিচয় রাখিতেই হইবে।

ভারতের দাবী

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ প্রণীত

দাম বার আনা

স্বাধীনতাপ্রয়াসী জাতীয় জীবনের নানা বিভাগের ত্রুটি-বিচ্যুতি গ্রন্থকার অতি নিপুণ ভাবে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আনিয়াছেন। (আনন্দবাজার)। চমৎকার লিনেন এ্যান্টিক কাগজে ঝক্‌ঝকে ছাপা—বইখানির সৌষ্ঠব সাধনে যথেষ্ট রুচির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। (বিজলী)।

প্রবাসী—বইখানি প্রত্যেক স্বদেশসেবী ও দেশমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। জাতির গলদ কোন্ খানে তাহা লেখক স্পষ্ট ভাষায় চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

হিতবাদী—এই পুস্তকের ৭টি প্রবন্ধই বেশ সুচিন্তিত, মূল্যবান ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। যাঁহারা দেশের উন্নতিকামী তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করা উচিত। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল।

বিজলী—গ্রন্থখানিতে নলিনী বাবু যথেষ্ট চিন্তাশীলতা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। এইরূপ উপাদেয় প্রবন্ধের বই আমরা বহুদিন পড়িনি।

আনন্দবাজার—প্রত্যেকটি অধ্যায় সুলিখিত ও সুসম্বদ্ধ। কার্য্যে পরিণত করিবার মত অনেক ভাব গ্রন্থকার দিয়াছেন। এ শ্রেণীর রাজনৈতিক গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বিরল।

মায়া-মৃগ

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

দাম এক টাকা বার আনা

পাঁচটি মনোরম গল্পের সমষ্টি। সর্ব্বোৎকৃষ্ট এ্যাণ্টিক কাগজে ছাপা। চারু-শিল্পী চারুচন্দ্র রায়ের অঙ্কিত সুদৃশ্য বহুবর্ণ প্রচ্ছদপট শোভিত।

প্রবাসী—নিখুঁত মনোরম ভাষায় হেমেন্দ্র বাবুর অসাধারণ দখল আছে। অথচ তাঁহার লেখার মধ্যে বর্ত্তমান প্রচলিত কাঁদুনির ছড়াছড়ি নাই। বর্ত্তমান রসদৈন্যতার দিনে হেমেন্দ্র বাবুর এই বইখানি সমাদৃত হইবে। বইটির প্রচ্ছদপট, ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর—বহিরাবরণ এত সুন্দর কম বাংলা পুস্তকেই দেখা যায়।

প্রবর্ত্তক—জীবননাট্যের এক একটা খণ্ড দৃশ্য বা আংশিক পরিচয় রুপালি গরিমায় ফুটাইয়া হেমেন্দ্র বাবু এই "মায়া-মৃগকে" বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কল্পনা ও ভাষা উভয়েরই ঐশ্বর্য্য আছে, যৌবনের ঘোরাল নেশাকে মাতায়—ছাপাই ও বাঁধাই সুন্দর—প্রকাশক ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিশার্স্‌দের সুনাম অটুট রাখিয়াছে। প্রচ্ছদপটটি সুকল্পিত ও যথাযোগ্য হইয়াছে।

ভারতবর্ষ—হেমেন্দ্র বাবু সুকবি; তাঁহার গদ্য রচনাও কবিত্ব-মণ্ডিত, একেবারে তন্ময় হইয়া তাঁহার বর্ণনা পড়িতে হয়। তিনি যেমন শব্দসম্পদের অধিকারী তেমনি প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁহার অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য।

ফুলের ব্যথা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

কবিতার বই—দাম এক টাকা

প্রবাসী—কবিতার যাহা কিছু উপকরণ, ছন্দ, ভাবমাধুর্য্য, লালিত্য সবই এই কবিতাগুলিতে আছে। ইহা কবির কবিখ্যাতি বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রচার করিবে। বইখানিব ছাপা ও মলাট মনোরম হইয়াছে, প্রচ্ছদপটখানি সুন্দর ব্যঞ্জনাভরা।

ভারতী—ভাবে, ছন্দে, ভাষায়, সুরে লেখক রঙ্গের ফুল ফুটাইয়াছেন। ফুলগুলি শুধুই বর্ণবাহার নহে, তাহাতে মধু আছে। সেগুলি সজীব প্রাণের তাজা উচ্ছ্বাস—শিশির-সিক্ত টাট্‌কা রসালো। বহিখানির কাগজ ছাপা বহিঃসৌষ্ঠব ভারি চমৎকার হইয়াছে।

শঙ্খ—কবিতাগুলির ভিতর কবি-প্রতিভার সম্যক পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কবিতার কোথাও জড়তা নাই, অস্পষ্টতা নাই, সঙ্কোচ নাই, ভাব ও ভাষার দৈন্য নাই। ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

প্রবর্ত্তক—হেমেন্দ্রলালের কবিতার উৎস শব্দসৌন্দর্য্যের বাগ্‌বৈখরীর মোহ নয়, প্রাণের ভাবালুতার স্পর্শ নয়। সে উৎস হইতেছে ভাবের পিছনে একটা চিন্তার সুস্থিরতা।

বীরবলের হালখাতা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত

দাম দেড় টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ ; চমৎকার এ্যান্টিক কাগজে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ছাপা—সুন্দর বাঁধাই।

বঙ্গবাণী—বীরবলের এই পুস্তকখানি সর্ব্বজন সুপরিচিত। ইহাতে বীরবলের ভাষা ও ভাবের বিশেষত্বযুক্ত ১৪টি সুচিন্তিত প্রবন্ধ আছে। ইহার ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অনবদ্য।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—প্রমথ বাবুর লেখায় এমন একটা মিষ্টি সুর ও মধুর ভঙ্গী আছে যেটা বাংলা সাহিত্যে একেবারেই নূতন। প্রমথ বাবু যে একজন মনে ও প্রাণে আর্টিষ্ট তা তাঁর লেখা পড়লেই বোঝা যায়।......"বীরবলের হালখাতার" লেখার অন্তরালে অনেকখানে একটা প্রচ্ছন্ন রহস্যের ও ব্যঙ্গের সুর—যাকে ইংরেজিতে বলে satire ফল্গু-ধারার ন্যায় প্রবহমান। ঐ প্রচ্ছন্ন রহস্য-সুরের ফল্গু-ধারা এখানে ওখানে যে একেবারে স্পষ্ট হাস্যধারার স্রোতস্বিনী হ'য়ে কলকল খলখল ক'রে না ওঠে তাও নয়।......প্রমথ বাবুর হাত থেকে যে লেখা বেরয় তা কাগজের ওপরে কাঠের পুতুল হ'য়ে ভাল মানুষটির মত দাঁড়িয়ে থাকে না। তাঁর লেখার বাক্যে বেগ আছে, সুরে রাগ আছে, অর্থে তেজ আছে।...প্রমথ বাবুর গ্রন্থে চিন্তার খোরাক খুজে নেবার জন্যে চোখে দুরবীণ লাগাতে হয় না। কেন না প্রতি পৃষ্ঠাতেই তা প্রচুর।......

(প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২৬)

বাঙ্গালায় বিপ্লববাদ

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ প্রণীত

দাম পাঁচ সিকা

প্রবাসী—ভারতের এতগুলি জাতির ভিতর হইতে হঠাৎ বাংলার মনই কেন বিপ্লবের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, বিপ্লবের চেতনা এবং প্রেরণা তাহারা কোন্ স্থান হইতে লাভ করিয়াছে, মুক্তির আশায় বন্ধনকে ছিঁড়িবার এই যে উন্মাদনা ও আগ্রহ ইহার মূল কোথায়, বাংলার সমাজ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতিতে বিপ্লব কেমন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, এবং জাতির জীবনে কোথায় তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার এরূপ সুশৃঙ্খল এবং সুসমঞ্জস আলোচনা বিপ্লববাদের আর কোন বাংলা পুঁথিতে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বইখানি বুকের দরদ দিয়ে লেখা, কিন্তু দরদের খাতিরেও ঘটনাগুলি অতিরঞ্জিত হইতে পারে নাই। বইখানা যে বেশ ভালো হইয়াছে পড়িলেই সে কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতে হইবে।

বাঁশরী—আমরা বইখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

নব্যভারত—অনেক কঠোর ঐতিহাসিক মালমসলা নলিনী-বাবুর লেখার মাধুর্য্যে সরল হইয়া উঠিয়াছে। "বাঙ্গালায় বিপ্লববাদ" বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যে একটি নূতন সম্পদ হইল।

ভারতবর্ষ—একেবারে তন্ময় হইয়া দুইবার পড়িয়াছি।